দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাঙ্গালির
অন্তর্জলি যাত্রা
— পৃঃ ১৩

রাজনীতির আড়ালে
জেহাদি শক্তির উত্থান
— পৃঃ ২৩

৭৩ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা।। ১৯ জুলাই, ২০২১।। ২ শ্রাবণ - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা

জেহাদি শক্তির উত্থান

Dil main
INDIA
Let's illuminate the nation with Make in India
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

১৯ জুলাই - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

রাজনৈতিক হিংসার আড়ালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বাভাষ ।। বিশ্বামিত্র ◻ ৬

লক রাজনীতি ডাউন ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

কাশ্মীরে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সুফল ফলতে শুরু করেছে ◻ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৮

মুসলমান কন্যার ভঙ্গুর পারিবারিক জীবন ও অধিকার ◻শেখর সেনগুপ্ত ◻১০

বাঙ্গালির অন্তর্জলি যাত্রা ◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻১৩

পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখতে চাইলে কেন্দ্রকে এই মুহূর্তে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻১৬

পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ হিংসায় রাজ্য প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যম নীরব ◻ অগ্নিশিখা নাথ ◻১৮

রাজনীতির আড়ালে জেহাদি শক্তির উত্থান ◻ ড. নীতীশ দাস ◻ ২৩

রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও জেহাদি আক্রমণে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক হিন্দুরা ◻ নীল বন্দ্যোপাধ্যায় ◻২৬

পশ্চিমবঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা শুধু রাজনৈতিক নয় ◻ পায়েল চট্টোপাধ্যায় ◻২৮

ভারতভূমির এক পবিত্র তিথি শ্রীগুরুপূর্ণিমা ◻ প্রবীর মিত্র ◻ ৩১

শ্যামাসংগীত সাধক নজরুল ◻ সুদীপ পাল ◻ ৩৩

গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভুলে ভারতে বিভেদের রাজনীতির গোড়াপত্তন ◻ ড. নারায়ণ চক্রবর্তী ◻ ৩৫

ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি হলো পশ্চিমবঙ্গে, সৌজন্যে রাজ্য সরকার ◻ বিশ্বপ্রিয় পাল ◻ ৩৮

বাঙ্গালি মেয়ের চুপকথার কাহিনি ◻ ড. অঞ্জনা পায়ড়া ◻ ৪৩

ধর্মান্তরকরণে পাকিস্তানের কালো ছায়া এখন ভারতবর্ষে ◻ রঞ্জন কুমার দে ◻ ৪৪

রাষ্ট্রবোধ পিষে ফেলতে আয়োজিত এক সংগঠিত সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন ◻ কল্যাণ গৌতম ◻ ৪৭

স্বদেশাভিমানের যথার্থ মঞ্চ সঙ্ঘ-শাখা ◻ প্রতাপাদিত্য গৌতম ◻ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র ১৯-২০ ◻ **অঙ্গনা** ২১ ◻ **সুস্বাস্থ্য** ২২

◻ **সমাবেশ- সমাচার** ৩০ ◻ **খেলা** ৩৯ ◻ **নবাঙ্কুর** ৪০-৪১◻

প্রকাশিত হবে
২৬ জুলাই
২০২১

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
২৬ জুলাই
২০২১

সঙ্ঘসেবা

সারা বিশ্ব এখন করোনা মহামারীর দ্বিতীয় আঘাতে দিশাহারা। এই আঘাতে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দেশ ভারতেও। এহেন পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যে অসুস্থদের সেবা ও পরিচর্যায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে সেটা বলাই বাহুল্য। ভারতের রাজ্যে রাজ্যে, শহরে শহরে, গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্ঘের সেবার মানচিত্র। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়। সঙ্ঘের সেবাকাজে কতটা উপকৃত হয়েছেন আমফান পরবর্তী বাঙ্গলা, কিংবা অতিমারীতে দিশাহারা পশ্চিমবঙ্গ— এসবেরই বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায়।

সত্বর কপি বুক করুন।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালি হিন্দুর বোধোদয় কবে হইবে?

ভারতবর্ষের নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিল বাঙ্গালি। বিশ্বজোড়া সুনাম ছিল বাঙ্গালির বুদ্ধিদীপ্ত জাতি হিসেবে। বাকি ভারতবর্ষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে বাঙ্গালিদের। সেইজন্যই মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, 'বাঙ্গালি আজ যাহা ভাবিতেছে, আগামীকাল তাহা বাকি ভারত ভাবিবে।' কালান্তরে সেই বাঙ্গালি'র ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহাদের সাধের মাতৃভূমি খণ্ডিত হইয়াছে। নিজ ভূমিতে তাহারা পরবাসী হইয়াছে। কলিকাতা, নোয়াখালি-সহ সমগ্র বাঙ্গলায় হিন্দুর রক্তে মাটি লাল হইয়াছে। অবশেষে মান, সম্মান, সম্ভ্রম হারাইয়া এই পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পাইয়া তাহারা ভাবিয়াছিল দুর্ভোগের বুঝি শেষ হইল। কিন্তু অচিরেই তাহাদের সেই ভাবনা ভুল প্রমাণিত হইল। ক্ষমতালোভী ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তোষণের রাজনীতি করিয়া পশ্চিমবঙ্গকেও জেহাদিদের মুক্তাঞ্চল করিয়া ফেলিল। চৌত্রিশ বৎসরে কমিউনিস্টরা জেহাদি ও সন্ত্রাসী শক্তিকে ব্যবহার করিয়া ভোট বৈতরণী পার হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছে।২০১১ সালে তাহাদের অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইতে রাজ্যবাসী পালাবদল করিয়াছে। কিন্তু অচিরেই আবারও মানুষের মোহভঙ্গ হইল। বর্তমান শাসকদল কমিউনিস্টদের চাইতে শতগুণে দমন পীড়ন চালাইতে শুরু করিয়াছে। ইহাদের প্রত্যক্ষ মদতে জেহাদিরা হিন্দুদের উৎখাত করিতে শুরু করিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশে পরিণত করিবার চক্রান্ত চলিতেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার ইহার পক্ষে প্রচার চলিতেছে।

অবস্থা চরমে উঠিয়াছে ২০২১-এর নির্বাচন পরবর্তী সময়ে। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থানে তাহারা হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া হিন্দুদের আক্রমণের লক্ষ্য করিয়াছে। গ্রামগ্রামান্তরে তাহাদের জেহাদি বাহিনী হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচারে মাতিয়া উঠিয়াছে। জেহাদিরা কত হিন্দুর জীবন লইয়াছে, কত বাড়িঘর, দোকানপাট নষ্ট করিয়াছে, কত মা-বোনের সম্ভ্রমহানি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এমতাবস্থায় পশিমবঙ্গের শাসন-প্রশাসন নির্বিকার। শুধুমাত্র রাজ্যপাল মহোদয় গ্রামে গ্রামে ছুটিয়া যাইতেছেন নিপীড়িত মানুষের পাশে। পশ্চিমবঙ্গের সংবাদমাধ্যম, তথাকথিত বুদ্ধিজীবরা মুখে কুলুপ আঁটিয়া রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের উপর নারকীয় অত্যাচারের বিবরণ শুনিয়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ নিন্দায় মুখর হইয়াছে। ভারতের বাহিরে থাকা বাঙ্গালি হিন্দুরা সেইখানেই ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাইতেছেন। বাংলাদেশের হিন্দুরাও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের উপর জেহাদি আক্রমণের প্রতিবাদ করিতেছেন। শুধু চোখ বন্ধ রাখিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচারকে ভারতীয় জনতা পার্টির অপপ্রচার বলিয়া দায় সারিতেছেন। আদালতের হুমকিতেও তিনি দমিতেছেন না। আদালতকে তিনি গ্রাহ্য করিতেছেন না।

তৃণমূলের জেহাদিদের আক্রমণে রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকার হিন্দুদের অবস্থা বাংলাদেশের হিন্দুদের চাইতেও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশের হিন্দুরা তাহাদের সরকারের নিকট বিচার পায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা পুলিশ-প্রশাসনের কাছে সুরক্ষা পাইতেছে না। এইরূপ বিষম পরিস্থিতিতে একটিই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বোধোদয় হইবে কবে? আর কতদিন তাহারা উদাসীন থাকিবে? শাসকদলের মদতে পশ্চিমবঙ্গ জেহাদিদের কবলে পড়িয়া পশ্চিমবাংলাদেশ হইলে তাহারা যাইবে কোথায়? সুখের কথা, কিয়দংশ হিন্দুর বোধোদয় হইয়াছে। তাহারা রাষ্ট্রবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা এখনও জেহাদিশক্তির মদতদাতা শাসকদলের সঙ্গে থাকিয়া নির্বিকার রহিয়াছেন তাহাদেরও ভাবিতে হইবে। না ভাবিলে এক বিরাট সর্বনাশের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো নরঃ।

দেশকালঃ বলং জ্ঞাত্বা সর্বকার্যাণি সাধয়তে।।

বকের মতো ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে রেখে, দেশ, কাল এবং নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞানীগণ কার্য সাধন করেন।

রাজনৈতিক হিংসার আড়ালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পূর্বাভাষ

বিশ্বামিত্র

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হতেই রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস শুরু হয়। সন্ত্রাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করে আপাতদৃষ্টিতে একে নেহাতই রাজনৈতিক বিবাদ মনে হলেও পরিস্থিতি যে খুব স্বাভাবিক নেই, তা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। দুটো ঘটনার উদাহরণ দিই। এক নম্বর, কলকাতার তিলজলায় রাজনৈতিক হিংসায় একটা হিন্দুমন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় একটি বাড়ির জ্বলন্ত ছবিকে সিপিএমের পার্টি অফিস বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। পার্টি নানাস্তর থেকে সমস্বরে চিৎকার জুড়ল ছবিতে চিহ্নিত জ্বলন্ত বাড়ি তাদের পার্টি অফিস নয় বলে। শেষ অবধি জানা গেল, সিপিএমের এক হিন্দু সদস্যের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। স্বয়ং বিরোধী-দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, নন্দীগ্রামে বিশেষ করে হিন্দুরাই আক্রান্ত হচ্ছেন বলে। সুতরাং এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে দিচ্ছে, কেবল রাজনৈতিক হানাহানির চরিত্র এটি নয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যম যাকে রাজনৈতিক হিংসা বলে চালাতে চাইছে, আশ্চর্যের ব্যাপার সেটা যদি তাই হয় তার মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক চরিত্র আছে, সেটাকে গোপন করা হচ্ছে কেন? কাদের স্বার্থে? বিষয়টি তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে।

এবার ভোটে বিজেপির মূল ইস্যু ছিল নাগরিকত্ব। এই নাগরিকত্বের দাবি নিয়ে আন্দোলন বাঙ্গলায় নতুন নয়। স্বাধীনতার পর দেশভাগের কারণে যারা উদ্বাস্তু হয়েছিলেন, তাদের নিয়ে রাজনীতির আসরে প্রথম নামে কমিউনিস্টরা। তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের নজিরবিহীন বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কীভাবে জনরোষ তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে নজর ঘোরাতে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির নামে তারা আন্দোলন সংগঠিত করে। সেই সময় কংগ্রেস সরকারের এ বিষয়ে চরম উদাসীন মনোভাবের সুযোগ নিয়ে বামেরা উদ্বাস্তু ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসায়। পশ্চিমবঙ্গে বামেরা একইসঙ্গে উদ্বাস্তু ও সংখ্যালঘু তকমা দিয়ে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক কবজা করে রাখতে পেরেছিল বলেই দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল।

তৃণমূল বামেদের এই কুক্ষিগত ভোটব্যাঙ্ক নিজেদের আয়ত্তে আনতে পেরেছিল বলেই রাজ্যে শাসন ক্ষমতায় আসতে পেরেছিল। কিন্তু অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার পর উদ্বাস্তু ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা টেনে দিলেন। প্রসঙ্গত, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংজ্ঞানুযায়ী এই বিভেদরেখার অস্তিত্ব আন্তর্জাতিকভাবে বহুদিনই ছিল। এবং ভারতে সেটা মানতে গেলে ধর্মীয় বিভাজনের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। কারণ দেশভাগ-জনিত কারণেই এই উদ্বাস্তু-স্রোতের উৎপত্তি হয়েছে এবং ধর্মীয় মানদণ্ডেই দেশভাগ হয়েছে। ফলে উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশকারী পরিচয়েও এই ধর্মীয় মানদণ্ডই এসেছে। এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একে সরকারি সিলমোহর দেওয়ায় একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীরা ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রত্যক্ষভাবে মদত জোগাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক হানাহানি নতুন নয়, কিন্তু কখনও মন্দির আক্রান্ত হতে কিংবা অপ্রধান বিরোধীদের আক্রান্ত হতে কেউ দেখেননি, ঠিক যেমনটি তিলজলায় বা চোপড়ায় হয়েছে। আগেও বহুবার অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে নানাভাবে সংঘাত বেঁধেছে। এবং সীমান্ত এলাকায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনাও বহু ঘটেছে। কিন্তু ভোট পরবর্তী হিংসার সুযোগ নিতে হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এই মুহূর্তে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে। কোনোরকম সাম্প্রদায়িক হিংসা যে তারা বরদাস্ত করবে না, এও সকলের কাছে দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। তাই হিন্দুদের ওপর আক্রমণের অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে রাজনৈতিক হানাহানির দিকে।

এই পরিস্থিতিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিতে পারতো সংবাদমাধ্যম। কিন্তু নেহাতই চটকদারি খবর পরিবেশনের বাইরে তাদের আর কোনও ভূমিকা নেই। তার ওপর শাসকদলের চাপও বিপুল পরিমাণে রয়েছে। মূলত সংবাদমাধ্যমের মনোভাবটা এখন এরকম, যারা জিতেছে তাদের কিছু বলা যাবে না। যেন জিতলেই সাতখুন মাপ— এই মনোভাবই সীমান্তের ও মুসলমান-অধ্যুষিত এলাকার হিন্দুদের সমূহ ক্ষতি করেছে। সংবাদমাধ্যম এই বিষয়টিকে লঘু করে দেখাতে একে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা-হিংসার তকমা দিয়ে চলেছে। রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসা সত্যিই হয়েছে, যার মধ্যে হয়তো কোনও সাম্প্রদায়িক প্রভাব নেই। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কিছুদিন পরে থিতিয়ে গিয়েছে। কিন্তু নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা, দুই দিনাজপুরের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় লাগামহীন সন্ত্রাসের খবর, কর্মীদের ঘরছাড়া হওয়ার খবর সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে ভেসে আসছে।

এবার ভোটের জনসংখ্যাগত চরিত্র মাথায় রাখা দরকার। মালদা, মুর্শিদাবাদের মতো জায়গায় যেখানে কংগ্রেসের এই দুর্দিনেও কংগ্রেস এবং তার সহযোগী সিপিএমের ফলাফল অত্যন্ত ভালো ছিল; এবারের বিধানসভা ভোটে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কারণ অনুপ্রবেশ- কবলিত এলাকায় ঢেলে ভোট গিয়েছে তৃণমূলের বাক্সে। ওদিকে ওখানকার হিন্দুরা বাঁচার তাগিতে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। এই বিন্যাসেই ভোটে হারার অজুহাতে হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছেন। এখন রাজ্য-প্রশাসন যদি সদর্থক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সীমান্তবর্তী হিন্দুরা যে বিপদগ্রস্ত হবেন, তা বলাই বাহুল্য। সেইসঙ্গে রাজ্যের সর্বত্র হিন্দুদের জন্য তা বিপদসংকেতের কাজ করবে। ◘

লক রাজনীতি ডাউন

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা

রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা মনে পড়ছে। জয় করে তবু তোর ভয় কেন যায় না? দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কাছাকাছি পেলে চুপি চুপি এই প্রশ্নটা করতাম। কেন সেটা বলছি। তার আগে দিদির হয়ে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। অনেকদিন আপনাদের চিঠি লিখতে পারিনি। শুধু আপনাদেরই নয়, বিধানসভা নির্বাচনের পরে তো সেভাবে কাউকেই চিঠি লিখতে পারিনি। লিখতেই পারতাম। কিন্তু পাঠাব কী করে! আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের মাধ্যম স্বস্তিকা প্রকাশই তো সম্ভব ছিল না। তাই চিঠি লিখলেও পৌঁছত না। কিন্তুবিশ্বাস করুন, মনে মনে অনেক কথাই লিখেছি।

লিখেছি, ভোটের পরে মানুষের মার খাওয়ার প্রতিবাদের কথা। লিখেছি, জাল ভ্যাকসিন দিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার চক্রান্তের কথা। লিখেছি,ট্রেন বন্ধ করে দিয়ে বাঙ্গলার মানুষকে দারুণ দুর্ভোগের মধ্যে ফেলে দেওয়ার কথাও। কিন্তু সেইলেখা,সেই কথাও কারও কাছে পৌঁছায়নি। সৌজন্যে আমার দিদি। এই চিঠি যখন লিখছি তখনও কিন্তু আপনাদের কাছে সময় মতো পৌঁছানোর কোনও গ্যারান্টি নেই। কারণ, খেয়ালখুশির লকডাউন মানুষের কাছে প্রতিদিনের দরকারি খাবারদাবার ঠিকমতো যেতে দেয়নি, তো সুন্দরের চিঠি!

আচ্ছা, বলুন তো রাজ্যে কি সত্যিই লকডাউন চলছে? বাজার হাট ঘুরে ঘুরে, রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে আপনাদের কারও কি সেটা মনে হচ্ছে? হচ্ছে না। তবু ট্রেন বন্ধ। শেষ দফায় যখন দিদি লকডাউনের সরি লকডাউন নয়, দিদির আলাপন ভাইয়ের ভাষায় 'সামুহিক আত্মশাসন'-এর নিয়ম শিথিল হলো সেদিন দিদি বললেন, 'উরি বাবা ট্রেন চালানো যাবে না। ট্রেন চালালে করোনা ট্রেনে করে বাড়ি পৌঁছে যাবে।' এই বক্তব্যের ঠিক তিন মিনিট একুশ সেকেন্ড পর পরে মহামান্য দিদি অন্য কথা বলেছেন। মনে আমার সেই কথাটা-- " এখন তো সংক্রমণের হার অনেক কম। এখন কেন উপনির্বাচনটা করাচ্ছে না? সাতদিনের সময় দিয়েই তো নির্বাচনটা করে ফেলা যায়। আমরা প্রস্তুত আছি।" দিদির এই কথা বলার দিনটা ছিল ২৩ জুন। এই চিঠি যখন লিখছি তখন ক্যালেন্ডার বলছে আজ ১৩ জুলাই। কিন্তু তখনই দিদি বলেছেন, ভোট করে নেওয়া যায় সাতদিনের মধ্যে। কিন্তু আজও ট্রেন চালু হয়নি। কিন্তু কেন?

এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দিদির রাজনীতি। ২ মে ভোটের ফল প্রকাশ হয়। দিদি অনেক শক্তি নিয়ে ক্ষমতায় আসেন। বিজেপির অনেক ভালো ফল করার কথা থাকলেও তা হয়নি। তার কারণ ব্যাখ্যার অনেক জায়গা রয়েছে। কিন্তু এটা ঠিক যে, রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিজেপিকে প্রধান ও একমাত্র বিরোধী দল হিসেবে দেখতে চেয়েছে। এতেই দিদির রাগ। অনেক সহজে মানানো যায় এমন সিপিএম, কংগ্রেসকে না দিয়ে মানুষ শুধু বিজেপিকে কেন এত আসন দিল? সেই ২ মে বিকেল থেকে শুরু হলো অত্যাচার। বিজেপি কর্মীদের মারধর, ঘরছাড়া করার পালা শুরু হলো। সেই সঙ্গে নারী নির্যাতন। মহিলাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারে দেশভাগের সময়কার বিভীষিকা মনে করাল বাঙ্গলাকে। আদালত থেকে মানবাধিকার কমিশন সবাই নিন্দা করেছে রাজ্য সরকারের। রাজ্যপাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক কিছু বলেছে। এরই মধ্যে করোনা টিকা নিয়ে বেনজির দুর্নীতি। ভুয়ো অফিসার দিয়ে ভুয়ো টিকার রমরমা কারবার। এত কিছু হয়েছে কিন্তু কোনও আন্দোলন হয়নি। দিদির প্রখর বুদ্ধিতে লকডাউন-ওষুধ কিছু করতে দেয়নি। কিন্তু এসবও বড়ো কথা নয়। আসল কথা আরও ভয়ানক।

চারদিকে নিন্দার মধ্যে বিজেপি কর্মীদের ঘরে ফেরানোর পালা শুরু হয়। আর সেই সময় পরিবার পিছু ২০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং বিজেপি না করার মুচলেকা দিয়ে বাড়ি ফেরানো হয়েছে। সব মেলালে যে বিপুল টাকা সংগ্রহ হয়েছে তাতে বিধাসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস যা খরচ করেছে তার বড়ো অংশই উঠে এসেছে। অন্যদিকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। নষ্ট হয়েছে ব্যবসা। আজ আপনারা সবাই জানেন, এই অত্যাচারে বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি বিজেপিকে যাঁরা ভোট দিয়েছেন তাঁদের উপরেও চলছে রাজনৈতিক জেহাদি আক্রমণ। আর তাঁদের সকলেই হিন্দু। ▯

কাশ্মীরে ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার সুফল ফলতে শুরু করেছে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ২৪ জুন জম্মু কাশ্মীরের ১৪টি অবিজেপি দলের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার সেখানে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করল। জম্মু-কাশ্মীরে নির্বাচিত সরকার বলবৎ করার ক্ষেত্রে বিজেপি ত্রিমুখী পরিকল্পনা নিয়েছে যার সময়সীমা অন্তত এক বছর। এর পরই সেখানে পূর্ণ রাজ্য ঘোষণার বিষয়টি বিবেচিত হবে।

এই ত্রিমুখী পরিকল্পনার প্রথমটি হলো স্বল্পমেয়াদি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করে দ্রুত সরাসরি জনগণের উপকার করা। এই ব্যবস্থায় তৃণমূল স্তরে নেতা তৈরির ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতীরাজ এর অধীনস্থ সংস্থাগুলির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা দিয়ে তাদের মধ্যে থেকে নেতৃত্ব তৈরি করে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মত বিনিময় জারি রাখা।

এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর ১৪ দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকে বরফ গলানোর সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। অবশ্য কেন্দ্র খুবই সন্তর্পণে পা ফেলছে কেননা সরকার জানে এই রাজনৈতিক দলগুলির জম্মু-কাশ্মীরে বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর ভরসা করা যায় না। দিল্লিতে এসে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার পর অনেকক্ষেত্রেই শ্রীনগরে ফিরে গিয়ে তারা অন্য মূর্তি ধারণ করে।

কেন্দ্র ভালোভাবেই জানে এই নেতারা নিজ নিজ কেন্দ্রের ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য আক্রমণাত্মক ভাষণ দিয়ে থাকে। এর মধ্যে একটা অংশ অবশ্যই সরকার বিরোধী। কেন্দ্র এব্যাপারে সতর্ক এবং পরিকল্পনার বাস্তবায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু কখনই আপাতভাবে এই দলগুলির ওপর কড়া প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে না। কারণ ওই নেতাদেরও টিকে থাকতে হবে এটা সরকার অস্বীকার করছে না।

২৪ জুনের মিটিঙের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হচ্ছে রাজ্যে বিভিন্ন নির্বাচনী ক্ষেত্রের পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি হওয়া। এই পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে মেনে নেওয়ার অর্থ কিন্তু পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টি যে এক বছর পেরিয়ে যাবে তা মেনে নেওয়া। অর্থাৎ এর আগে বিধানসভা নির্বাচনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ হওয়ার আনুমানিক সময়সীমা মার্চ ২০২২ সাল। আর বিধানসভা নির্বাচন এরও কয়েক মাস পরে হবে।

ইতিমধ্যে কেন্দ্র তৃণমূল স্তরে উন্নয়নের কাজ পুরোদমে শুরু করে দিয়েছে। এই ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া পাওয়ার সংবাদেই অত্যন্ত তিক্ত বিরোধিতায় অভ্যস্ত দলগুলির সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্তরে বিজেপি আলোচনায় বসেছে।

এই তৃণমূলস্তর থেকে সংবাদ সংগ্রহ করার পরিকল্পনা ২০১৯- এর এই আগস্ট (বিভাজনের দিন) থেকেই করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সরকার জানতে পারে কেন্দ্রশাসিত

পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে বহিষ্কৃত ৫৩০০টি পরিবারের জন্য যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল তাদেরই পুনর্বাসন প্যাকেজ নেওয়া হয়েছে। এই নীতির ফলে তারা জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী নাগরিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

বলে ঘোষিত অঞ্চলগুলিতে সরকারের সমর্থনে সাড়া মিলেছে। তাই এই সময়েই বিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা ও নির্বাচনের পথ প্রশস্ত করার সেরা সময়। সকলেই জানেন আগেকার special status অবলপ্ত করে জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে দুটি আলাদা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

এই অঞ্চলে দুটি প্রধান অবিজেপি দলগুলি হলো মেহেবুবা মুফতির পিডিএফ, আবদুল্লাদের ন্যাশানাল কনফারেন্স, কংগ্রেস-সহ আরও ছোট ছোটো দু' চারটি দল যারা এই নতুন ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করেছিল।

এই বিরোধিতায় বিচলিত না হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে যায় এবং এমন কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেয় যা কালক্রমে ভালো ফল দিতে শুরু করে। যার ফলে এই বিরোধী দলগুলি তৃণমূল স্তর থেকে সরকারের বিরোধিতা করার মতো তেমন সমর্থনই জোটাতে পারেনি।

সরকারের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করা। সকলকে অবাক করে জনতার ৫১.৭ শতাংশ ভোটে সানন্দে অংশ নেয়। ২০২০ সালে এই ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল নির্বাচনে সর্বপ্রথম ১০০ জন মহিলা প্রতিনিধি, ২৮০ জন জন প্রতিনিধি অতি দুর্গম অঞ্চল থেকেও নির্বাচিত হন। ২০টি জেলায় এই প্রথমবার কোনও ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের অস্তিত্ব দেখা যায়। এদের প্রত্যেককেই সরকারের তরফ থেকে ডেপুটি কমিশনারের পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

এই প্রথমবার জম্মু-কাশ্মীরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বাস্তব প্রয়োগ হয়। এরই ফলে ২ জন মহিলা, ২ জন

উপজাতি ও ২ জন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ নির্বাচিত চেয়ারম্যান হয়েছেন।

ভোট প্রক্রিয়ায় কোনো বেনিয়ম বা জালিয়াতি ছিল না। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ২৮০টি আসনের জন্য ২১৭৮ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ৪৫০ জন ছিলেন মহিলা। এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এতদিন অবহেলিত সকল সম্প্রদায়ের লোকই ছিল বিশেষ করে schedule tribe সম্প্রদায়ের।

এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ২১টি বিষয়ে কাজ করার বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। যার মধ্যে ICDS, অঙ্গনওয়াড়ি, মনরেগা, খনিজ উত্তোলন প্রভৃতি রয়েছে। এই নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির অ্যাকাউন্টে ১৫০০ কোটি টাকা জমা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা দ্রুত খরচ করতে পারে।

নব গঠিত Dlimitation কমিশনের দায়িত্ব বিধান সভা আসনগুলির পুনর্গঠন। এ ক্ষেত্রে জম্মুবাসীদের দীর্ঘ দিনের দাবি তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে আসনের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই ধরনের অসঙ্গতির মীমাংসা করে কাজ শুরু করে দেওয়া কমিশন আগামী ২০২২ মার্চের পর চূড়ান্ত রিপোর্ট দেবে। এটা স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নেওয়া যায় জম্মু ক্ষেত্রে আসনের সংখ্যা বৈধ কারণেই বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখা দরকার, ৩৭০ ধারা ও উপধারা ৩৫ এ বিলোপের পর সেখানে বসবাসের সম্পূর্ণ নতুন একটি domicile policy তৈরি হয়েছে। নতুন লাগু হওয়া দীর্ঘদিনের উপেক্ষিত এই 'বসবাস নীতি' বহু অবহেলিত মানুষের উপকারে আসছে। যারা এতদিন কাশ্মীরে বসবাসের অধিকার থেকেই বঞ্চিত ছিল। বহু সম্প্রদায়ের মানুষ এই প্রথম সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় (যেমন বাল্মীকি, যারা কেবল আবর্জনা সাফের কাজে নিযুক্ত ছিল যুগ যুগ ধরে)। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু গোর্খা সম্প্রদায়ের মানুষজন। POK থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া বহু মানুষ ও বিশেষ করে মহিলারা। নতুন নীতির ফলে যুগ যুগান্ত ধরে চলে আসা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ছাড়াও তাদের কাছে বহু সুযোগের পথ খুলে গেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে বহিষ্কৃত ৫৩০০টি পরিবারের জন্য যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিল তাদেরই পুনর্বাসন প্যাকেজ নেওয়া হয়েছে। এই নীতির ফলে তারা জম্মু কাশ্মীরের স্থায়ী নাগরিক হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

একই সঙ্গে সরকারি দপ্তরগুলিতে কর্মরত কর্মীদের জন্য সরকারের তরফে ৭ম বেতন কমিশন লাগু করায় তারা তৎকাল অর্থকরী সুবিধের অধিকারী হয়েছে। এছাড়া এতকাল কেবল খাতায়-কলমে আটকে থাকা জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের মতো নাগরিকদের অত্যাবশ্যক আটকে থাকা পরিকল্পনাগুলি দ্রুত রূপায়ণ করে মানুষজনকে তাড়াতাড়ি সুবিধে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রাণঘাতী হামলার সংখ্যাও লক্ষণীয়ভাবে কমে এসেছে। এতগুলি সদর্থক বিষয় তৃণমূল স্তরে লাগু করা এবং জনগণের হাতেনাতে সুফল পাওয়ার ও খুশি হওয়ার খবর কেন্দ্রের কাছে আসতে দেরি হয়নি।

এরই প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতিতে 'Gupkar group' ও অন্যান্য অ-বিজেপি দলগুলি ক্রমশ অস্তিত্ব সঙ্কটের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতাও হারাতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মূল স্রোতে ফেরার জন্য তাদের কেন্দ্রের সঙ্গে পারস্পরিক আলোচনায় যোগ দেওয়া ছাড়া গতি ছিল না।

পুরনো দলগুলি বুঝতে পারে এ ছাড়া তাদের কাছে বিকল্প কোনও রাস্তা খোলা নেই। কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনার যোগ না দিলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতে আসা নতুন নেতৃত্বই তাদের মূল রাজনৈতিক ধারা থেকে হটিয়ে দেবে। এদিকে সময়ও ফুরিয়ে আসেছ। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় আগামী বছর নির্বাচনও হতে পারে। এই অবস্থায় কেন্দ্র সবসময়ই সতর্কিত পদক্ষেপ করেই এগোবে এবং প্রয়োজনে জম্মু কাশ্মীরের জন্য যে চূড়ান্ত রোড ম্যাপ তৈরি করেছে পরিস্থিতি বুঝে তাতে প্রয়োজনীয় কিছু রদবদলও করে নিতে পারে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।

(বিভিন্ন সূত্র থেকে সংকলিত)

শোক সংবাদ

কলকাতা মহানগরের দেশপ্রিয় ভাগ কার্যবাহ উজ্জ্বল ঘোষের মাতৃদেবী কৃষ্ণা

ঘোষ গত ২ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার বিভাগের সহ বিভাগ প্রচারক মথুরা হেঁস

গত ৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁক বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। বর্ধমান জেলার কাটোয়া খণ্ডের কৈথন গ্রামের স্বয়ংসেবক মথুরা হেঁস চার বছর বিস্তারক থাকার পর ১৯৯৯ সালে সঙ্ঘের প্রচারক হন।

মুসলমান কন্যার ভঙ্গুর পারিবারিক জীবন ও অধিকার

আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারতীয় জনতাপার্টি ক্ষমতায় আসবার পর এবং দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে মুসলমান কন্যারা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার অনেকটাই অর্জন করতে পারলেন।

শেখর সেনগুপ্ত

প্রায় দু'দশক যাবৎ নগর কলকাতার উপকণ্ঠে যে এলাকায় আমি সপরিবারে বসবাস করছি, সেখানে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক এবং তাঁরা সকলে বাংলা ভাষাতেই কথা বলে থাকেন। অনেকের উচ্চারণে পূর্ববঙ্গীয় টান লক্ষণীয়। মহরমের মিছিলে তাদের অজস্র মুখ দেখতে পাই। স্থানীয় ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চে গিয়ে ঢুকলে বা রেশনের দোকানের দিকে তাকালে বিলক্ষণ বুঝতে পারি, বর্তমানে এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলটি এদের সমর্থন লাভের জন্য কতটা উদার ও মরিয়া।

তত্ত্বগতভাবে কোন ব্যক্তিকে আমরা মুসলমান বলব? এর উত্তর হলো, তিনিই প্রকৃত মুসলমান, যিনি নিম্নোক্ত দুটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছেন ঃ প্রথমত, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়; দ্বিতীয়ত, ইসলামের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পয়গম্বর অর্থাৎ দূত।

একাধিক মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে এবং সেই সূত্রে আমি জানবার চেষ্টা করেছি, পরিবারে বোরখা পরিহিতা ওই মুসলমান বিবিদের প্রকৃত অবস্থাটা আজও কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? প্রথমেই জানাই একটি নির্মম প্রথাকে, যা বলছে যে একজন মুসলমান পুরুষ তাঁর হারেমে চার-চার জন বিবিকে ঠাঁই দেবার হকদার। তবে চারজন বিবি থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি যদি আরও এক রমণীকে শাদি করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, তাঁকে সেই পঞ্চম শাদির পূর্বে কোনও একজন বিবিকে তালাক দিতেই হবে। অর্থাৎ চার জনের বেশি বিবিকে রাখা যাবে না। আবার প্রতিটি শাদিকেই বৈধ করতে গেলে এই সমস্ত শর্তাদিকেও মান্যতা দিতে হবে ঃ

(১) দেন মোহর অর্থাৎ স্ত্রীধন, (২) স্ত্রীর খোরপোশ, (৩) স্বামীর নিবাসে স্ত্রীকে থাকতে হবে, (৪) বিবাহিত জীবনে একমাত্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীকে তার আনুগত্য বজায় রাখতে হবে, (৫) স্বামীর সহবাসের ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে হবে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে আলোড়িত হয়েছি বিবাহিতা, বোরখায় ঢাকা মুসলমান রমণীদের পারিবারিক জীবন ও অসহায়তা অনুধাবন করতে গিয়ে। একজন মুসলমান পুরুষ কী তবে কার্যত সেই অশ্বারোহী, যিনি চারটি ভেড়াকে বেঁধে নিয়ে যখন ইচ্ছা, যেদিকে খুশি, ছুট লাগাতে পারেন? এই নিয়ে প্রশ্ন করবার সুযোগ যখনই এসেছে, বিবাহিতা সংশ্লিষ্ট মুসলমান নারী তাঁর অভিমত না জানিয়ে ত্বরিতে ও সভয়ে সরে গেছেন। কেবল একদা একজন উচ্চশিক্ষিতা হিন্দু যুবকের বিবাহিতা মুসলমান স্ত্রী এবং পেশায় অধ্যাপিকা, আমাকে অপ্রতিরোধ্য প্লাবনের ন্যায় স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, 'শুনুন কাকু, মুসলমান নারীদের দীর্ঘশ্বাসকে সত্যমিশ্রিত কল্পনার সাহায্যে আপনার লেখায় কতটা অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হবেন, আমার সন্দেহ আছে। আমি কেবল হাতজোড় করে অনুরোধ করছি সকল মুসলমান মেয়েদের। তোমরা বারবার সেলাম জানাও এই দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে তিন তালাক প্রথাকে অবৈধ এবং অসাংবিধানিক ঘোষণা করবার জন্য। কত শত বছর অতীত হয়ে যাবার পর এই সুবিচারটুকু তোমরা পেলে'। আমি সেই কন্যাসমা বিদূষীর প্রতি মর্যাদা জানিয়ে এমত চর্চার পরিধিকে বিস্তারিত করবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছি অতঃপর। চলে গেলাম ১৯৩৭ সনে, যেবার শরিয়ত কানুন অবিভক্ত ভারতে প্রথম জারি হয়। একটি দেশের সব নাগরিকদের জন্য কোড অব ল নয়, এরকম টালমাটাল অবস্থা কীভাবে যে মেনে নেওয়া হলো, ভাবতে গেলে ভ্রূকুঞ্চন অনিবার্য।

ভারতে কার্যকর শরিয়তি কানুন সেই বিরল দৃষ্টান্তকেই স্থাপন করেছে। ১৯৩৭ সন থেকে সেলাম আদায়কারী সেই কানুনকে প্রথম আঘাত শানায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত ২২ আগস্ট, ২০১৭। সেই দিন থেকে এই দেশে মুসলমানদের শরিয়তি বিধান 'তিন তালাক' অকার্যকর ও অসাংবিধানিক রূপ পেল। প্রধান বিচারপতি দে. এস. খেহরের নেতৃত্বে ৫ জন বিচারপতির মধ্যে ৩ জনই 'তিন তালাক' কে সেই মুহূর্ত থেকে নিষিদ্ধ করবার পক্ষে রায় দেন। প্রধান বিচারপতি সমেত ২ জন আলাদা একটি আইন প্রণয়নের কথা বললেও বাকি ৩জনই তৎক্ষণাৎ ওই অমানবিক এবং মহিলা পীড়নের উৎসকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করবার পক্ষে নিজেদের অভিমত জানান।

'তিন তালাক' প্রথার বয়স তখন ১৪০০ বছর। সেই প্রথার অবসান ঘটায় স্বস্তি ও মর্যাদা অনেকটাই উন্মুক্ত হলো ভারতীয় মুসলমান কন্যাদের জন্য। সুপ্রিমকোর্টে 'তিন তালাক'-এর বিরুদ্ধে যে কয়েকজন তেজস্বিনী মুসলমান কন্যা মামলা করেছিলেন, তাঁদের অন্যতমা ইশরাত জাহান কী বলেছিলেন, আজ আমি আপনাদের তা জানাতে চেষ্টা করছি ঃ 'আমার লড়াইটা যখন শুরু করি, তখন মনে হয়েছিল, অধিকাংশ পরিবারবদ্ধ মুসলমানমদের দুনিয়ায় বুঝি পাগলাঘন্টি বেজে উঠল। তাঁরা আমাদের প্রতি এমন খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন যে আমরা তখন প্রকৃতই বিপন্নবোধ করি। আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, শরিয়তি প্রাধান্যে এবার একটা বড়ো আঘাত সত্যি সত্যি আমরা হানতে পারব। আজ সেই লড়াইতে জিতে আমি তথা তামাম মুসলমান রমণীরা যেন সমবেতভাবে গর্ব ও স্বস্তি অনুভব করছি। ....অতঃপর মুসলমান পুরুষদের বৃহৎ অংশ নারীদের শুধুমাত্র ভোগ্যপণ্য কিংবা নরমশরম গৃহপালিত জীবরূপে গণ্য করবে না। পুরুষরা ধরেই নিয়েছিল, তাদের বিবিদের সম্মানবোধ থাকবার দরকারই নেই। সড়কের ওপর দিয়ে পূর্ণগতিতে ছুটে চলা গাড়ির মতো চলবে পুরুষদের একচেটিয়া দাপট ও সিদ্ধান্ত। মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারীদের মধ্যে এই যে বিশাল ফারাক, এটা যেন খোদারই বিধান। তাই, এমনকী ফোন তুলে স্বামী যদি তাঁর এক বিবিকে বলে বসে, 'তালাক, তালাক, তালাক', সেই আড়ষ্ট বিবি মুহূর্তে তার পায়ের তলা থেকে মাটি হারাবে। হকচকিয়ে যাবে। তাকিয়ে দেখবে তার চারিদিকে নিরেট শূন্যতা। সে আশ্রয়হীনা, তার আয়ত্তে প্রতিরোধের কোনও আয়ুধ নেই, নেই কোনও কানুনি প্রতিরক্ষা। মুসলমান কন্যাদের ওই পারিবারিক অসহায়তার কথা ভাবলে ধর্মনির্বিশেষে কোন নারীর হৃদয় ভারাক্রান্ত হবে না? বৃহৎ বৃহৎ সেলাম ভারতের শীর্ষ আদালতকে।'

'Joint movement committee for abolition of Triple Talak' সংস্থার তরফে প্রফেসর সৈয়দ তনবির নামরিন বললেন, 'ভারতীয় মুসলমান কন্যাদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ধরনের অত্যাচার, অবিচার চলে আসছিল, তাদের নিহিতার্থ, অন্তর্গূঢ় দ্যোতনাও এতদিনে উন্মোচিত হলো কোটি কোটি বিবাহিত মানুষের নিকট। ভারতের শীর্ষ আদালত এতদিনে তার আংশিক বিহিত করলেন। আরও বহু অবিচার ঢাঁই করে রাখা আছে। তাই এই লড়াই জারি থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গের শিয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা মওলনা সৈয়দ কাতাহার আব্বাস বিজতি বললেন, 'এই বেআক্কেলে প্রথার অবসান হওয়া উচিত ছিল বহু আগেই। কত লক্ষ অসহায় মুসলমান রমণী যে ওই বিধানের শিকার হয়েছেন এ যাবৎ তার এক ক্ষুদ্রাংশের বিবরণ বের করতে গেলেও আমাদের পর্বতপ্রমাণ মালপত্তর সরাতে হবে।'

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহর্ষে বললেন, 'শীর্ষ আদালতের এই রায় আদ্যন্ত ঐতিহাসিক। আমি নিজে মজে গিয়েছি এই রায়ের গুরুত্বে। বার্তাটি যখন আসমুদ্র হিমাচল পৌঁছে যাবে মুসলমান রমণীরা বিরাট স্বস্তি পাবেন। এমনকী একান্তভাবে রক্ষণশীলতায় আবৃতা মহিলরাও এই রায়কে সানন্দে স্বাগত জানাবেন বলে আমার প্রত্যয়। এই আইন মুসলমান কন্যাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দেবে পুরুষের সঙ্গে বহুলাংশে সমানাধিকার'।

লেখিকা তসলিমা নাসরিন জানালেন 'ভারতের সুপ্রিমকোর্ট যেন একটা হ্যাঁচাটানে যুগযুগান্ত ধরে চলে আসা মুসলমান ভগ্নীদের ওপর সেই ভয়ংকর ও কুৎসিত অত্যাচারের অবসান ঘটালেন। তবে এখনও ঘুরঘুর করছে বহুবিধ বুক ধড়ফড়করা অমানবিক বিধি যাদের হাত থেকে মুসলমান মেয়েদের রক্ষা করতেই হবে। মেয়েদের ক্ষমতায়ন বাড়বে। আমার দাবি সমানাধিকার'। সুপ্রিমকোর্টের ওই রায় যখন মুসলমান, অ-মুসলমান সমাজের অক্ষাংশে দ্রাঘিমাংশে সুপবনকে বহমান রাখছে, তখন কিন্তু আমাদের এই রাজ্যেরই একজন বিশিষ্ট মন্ত্রী তথা 'জমিয়তে উলেমার হিন্দ'-এর রাজ্য সভাপতি সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী সুপ্রিমকোর্টের ওই রায়কে কটাক্ষ করে বলে উঠলেন, 'আমার কিন্তু সন্দেহ তিনতালাক নিয়ে আদালতের আদৌ কোনও রায় দেবার অধিকার আছে কিনা।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

আমি কিন্তু ভুলতে পারি না যে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদেরও বহু অমানবিক আচার-আচরণের ওপর ইতি টানতে হয়েছে আমাদের। দেশের সংবিধান ও বিচার ব্যবস্থাই হয়েছে নির্যাতিতের মুখ্য আশ্রয় ও বলভরসা। এই মুহূর্তে আমার স্মরণে আসছে বিরল প্রজাতির সাহিত্যিক কমলকুমার মজুমদারের অনন্য উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা'। মৃত্যুপথযাত্রী অশীতিপর এক কুলীন ব্রাহ্মণ একটি নাবালিকাকে বিয়ে করলেন তাঁর গঙ্গাযাত্রাকালে। তারপর উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক ও মানসিকতার টানাপোড়েন। সেই যুগের নমুনা হিসাবেও গল্পটি অসাধারণ। তখনকার হিন্দু সমাজপতিরা প্রায়শ নীতির নামাবলী গায়ে চড়িয়ে যা সব করে বেড়াতেন, তা অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ধান্দাবাজদেরই মানায়। এরকম নজিরও আছে যে, এক কুলীন ব্রাহ্মণ শতাধিক নারীর পতি হয়ে দাপটে হরেক শ্বশুরবাড়ি চষে বেড়াচ্ছেন। বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, বিবেকও নেই। আজ কিন্তু সেই উচ্ছন্নে যাওয়া সমাজ সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে আইনের গুঁতো খেয়ে। এখন একজন হিন্দু পুরুষ একের

অধিক স্ত্রীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার উদ্যোগ নিলে তাঁর ঠাঁই হতে পারে একমাত্র হাজতেই।

দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু নাগরিকরা যখন এই বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশকে মাথায় তুলে রেখেছেন, তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা কেন দেশের আইনকে পাশ কাটিয়ে শরিয়তি বিধানকেই সর্বাধিক মান্যতা দেবেন? এই নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। শরিয়তকে আইনের মর্যাদা দেবার পশ্চাতে একটি পরম্পরা রয়েছে। এর ব্যাখ্যা রয়েছে ধারা ৩(১) তে, যেখানে বলা হয়েছে, ১৮৭২ সন থেকে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরা তাঁদের শরিয়তি কানুন মোতাবেক চলবেন বলে যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কিন্তু আদতে শরিয়ত কোনও কালেই বাধ্যতামূলক নয়। এখানে মুসলমান নাগরিকদের সামনে অপশন থাকছে। যদি কোনও মুসলমান নাগরিক মনে করেন যে, তাঁর জীবন যাপনে শরিয়তের উপযোগিতা অনস্বীকার্য, তিনি এই বিষয়ে রচিত শরিয়তি অঙ্গীকারপত্রে স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর দেবেন। ভারতে শরিয়তে দরকারি সংশোধনও আনা হয়েছে। যেমন আদিতে শরিয়তে এইরকম বলা হয়েছিল ঃ যদি কোনও মুসলমান রমণী জেলা জজের সমীপে সুবিচারের জন্য আবেদন দাখিল করেন, মহামান্য আদালত শরিয়ত নির্দেশিত যত প্রকারের বিধি রয়েছে ওই জাতীয় অভিযোগের বিষয়ে তার সবগুলিকে চর্চার মধ্যে এনে তবেই সংশ্লিষ্ট মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত জানালেও জানাতে পারেন। বর্তমানে কিন্তু আইনি ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে আদালতের অবস্থানকে কঠোরতর করতে। বর্তমানে কানুনের নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি আর কার্যকর নয় ঃ *১৮২৭ প্রবর্তিত মুম্বাইতে অনুসৃত ৪ এর ২৬ নম্বর ধারা; *১৮৭৩ সালের মাদ্রাজে দেওয়ানি আইনের ১ নম্বর ধারা; *সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ, আগ্রাশহর এবং তামাম অসমে মুসলমানদের ব্যক্তিগত আইনের ৩ নম্বর ধারা (১৯৪৩)।

শরিয়তের বিভিন্ন নির্দেশকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হলেও এই দেশেরই পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম ও আগ্রা শহরে শরিয়ত প্রয়োগ করবার আগে নিম্নোক্ত শর্তগুলিকে মুসলিম কর্তারা মানতে বাধ্য ঃ

(ক) কেসটিকে হাইকোর্টের অর্ডিনারি সিভিল জুরিসডিকসনের মধ্যেই রাখতে হবে;

(খ) উভয় পক্ষকে মুসলমান হতে হবে;

(গ) বিচারের বিষয় হবে—বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ, বিশেষ ধর্মীয় প্রথা, কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান;

(ঘ) ওয়ারিশান অর্থাৎ উত্তরাধিকার।

মুসলমান মেয়েদের প্রতি যতই অমানবিক আচরণ চলুক না কেন, ইতিহাসের নগণ্য ছাত্র হয়েও আমি জানি, ভারতেরই একাধিক মুসলমান ললনা তাঁদের ব্যতিক্রমী প্রতিভা, সাহিসিকতা, নিজস্ব শিক্ষা ও আদর্শকে পুঁজি করে কত অসাধ্যকে সাধন করেছেন। হারেমের বিধি আঁচড়াতে এলেও পা-হড়কে পড়ে যাননি বা ডায়াবেটিক রোগক্রান্তদের মতো নিঃজীম ক্লান্তিতে দূরেও সরে যাননি নিজস্ব কর্মভুবন থেকে। এখানে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করছি—সুলতানা রিজিয়া, মেহেরুন্নিসা (নুরজাহান), টিপু সুলতানের পঞ্চম প্রজন্মের তেজস্বিনী কন্যা নরুসেল্লা এনায়েত খাঁ, বিপ্লবের বহ্নিশিখা মালেকা কোম, লেখিকা তসলিমা নাসরিন প্রমুখ। দুনিয়ার বহু মুসলমান প্রধান দেশে কিন্তু বিবাহিতা নারীদের সম্মান ও নিরাপত্তা অনেক বেশি। গবেষিকা অঞ্জলি চক্রবর্তী 'ভাবনা-চিন্তা' পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁর একটি দীর্ঘ নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, '..... মালয়েশিয়া, তুরস্ক, টিউনিসিয়া, আলজিরিয়া, জর্ডন, সিঙ্গাপুর এমনকী পাকিস্তান ও বাংলাদেশেও বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের অনুমতি ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। এই সকল মুসলমান প্রধান দেশে ব্যক্তিগত আইনে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। এই সকল পরিবর্তন হেতু সেই সকল দেশের তালাকপ্রাপ্ত নারীদের পুনর্বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা আজীবন খোরপোশের ব্যবস্থা অথবা এককালীন আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান বর্তমানে বাধ্যতামূলক।.....'

আর আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারতীয় জনতাপার্টি ক্ষমতায় আসবার পর এবং দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশে মুসলমান কন্যারা তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার অনেকটাই অর্জন করতে পারলেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১। মুসলিম বিবাহ-বিচ্ছেদ ও ভারতীয় সমাজভাবনা—জিয়াদ আলি

২। পারিবারিক আইন প্রেক্ষিতে হিন্দু ল ও মুসলিম ল—জাস্টিস কৃষ্ণকিশোর বক্সি এবং শেখর সেনগুপ্ত

৩। Qur'an and women : R-Reading Sacred Text from a woman's Perspective, 1999–Amina Wadud

৪। ধর্মে প্রথায় ও আইনে ভারতীয় নারী—অঞ্জলি চক্রবর্তী

With Best
Compliments from :

A
Well Wisher

বাঙ্গালির অন্তর্জলি যাত্রা

ড. জিষ্ণু বসু

বাঙ্গালি ভারতের নবজাগরণের কাণ্ডারি ছিল। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ভারতবর্ষ 'বন্দে মাতরম্' পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকেছেন 'ভারতমাতা'। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ পুনর্স্থাপিত করেছেন ভারতমাতাকে। রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জাতীয় সংগীত। সেই বাঙ্গালি আজ অন্তর্জলি যাত্রার পথে। বাঙ্গালি হিন্দুর কাছে ২০২১-এর নির্বাচন সাধারণ কোনো খেলা ছিল না, ছিল জীবন মরণের লড়াই। খাগড়াগড়ের বিস্ফোরণ, কালিয়াচকের থানা জ্বালিয়ে দেওয়া, দেগঙ্গা, ধুলাগড় বসিরহাটের দাঙ্গার পরে বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্বটাই বিপন্ন মনে হয়েছে।

১৯৪১ সালের আদমসুমারিতে ব্রিটিশ বেঙ্গলের হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৪২ শতাংশ। এর সঙ্গে কোচবিহারের মতো দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যা যোগ করলে প্রায় ৪৬ শতাংশ বাঙ্গালি হিন্দু ছিলেন। ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গের ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা মোট ২৩ কোটি ৪৫ লক্ষ মানুষের মাত্র ৩১.০৯ শতাংশ হিন্দু। ২০২১ সালের আদমশুমারির জন্য অপেক্ষা করার আগেই বলা যায় যে এই সংখ্যা ৩০ শতাংশের অনেক নীচে নেমে যাবে। বিগত মাত্র ৭০ বছরে কীভাবে একটা সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত, সম্পন্ন জাতির জনসংখ্যার ১৬-১৭ শতাংশের হ্রাস হয়ে গেল তার অনুভব এ রাজ্যের মানুষের গত মাসাধিক কালে হয়েছে।

বাঙ্গালি হিন্দুর এমনই একটা বিপদের সময় আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন। আরও ২৫০ বছর পরে রাজা রামমোহন এসেছিলেন বাঙ্গলার নবজাগরণের সূচনা করে। যদি বিগত ৭০ বছরে যে হারে হিন্দুদের সংখ্যা কমেছে তা অব্যাহত থাকে, তবে আজ থেকে ২৫০ বছর পরে বাঙ্গালি হিন্দুর সংগ্যা ৬ শতাংশের মতো হবে। আজ থেকে ৫০০ বছর পরে মাত্র ১.২১ শতাংশ হয়ে যাবে। বাঙ্গালি হিন্দুর বিলুপ্তির এই হিসেব কোনো জ্যোতিষীর হিসেব নয়, সাধারণ গুণোত্তর প্রগতিতে প্রাপ্ত হিসেব। সমাজবিজ্ঞানীদের হাতে যেসব 'কারেকশন ফ্যাক্টর' থাকে, তাতে একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু মূল অঙ্কটা মোটামুটি একই থাকবে। এই বিপন্নতার অনুভব গ্রামের মানুষ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে করেছেন। শহর কলকাতা ও তার সংলগ্ন মানুষ, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা করেননি। কিন্তু মানুষের মতামতে যেখানেই প্রার্থীরা হিম্মতের সঙ্গে পুনর্গণনা করাতে পেরেছেন, সবকটিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় হয়েছে।

১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিধানসভার মুখ্যমন্ত্রী হলেন ড. বিধানচন্দ্র রায়। বিরোধী দলনেতা জনতা দলের প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৭৭ সালে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর বিধানসভাতে বিরোধী দলনেতা জনতা দলের প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের সঙ্গে ছিলেন ২৯ জন বিধায়ক। সে বছর কংগ্রেসের ২০ জন বিধায়ককে যুক্ত করলেও সংখ্যাটা ৪৯ হতো। ২০০১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত বিধানসভাতে বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলেন ৬০ জন বিধায়ক। ২০০৬ সালে তা অর্ধেক হয়ে হয়েছিলেন ৩০ জন। তাই এবারের বিরোধী নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির শুভেন্দু অধিকারী এ রাজ্যের ইতিহাসের সর্বোচ্চ সংখ্যা নিয়ে বিধানসভার বিরোধী নেতা হয়েছেন। রাজ্যের মানুষ ভোট দিয়ে তার সঙ্গে ৭৭ জন বিধায়ককে বিধানসভাতে পাঠিয়েছেন। যা এ রাজ্যের সর্বকালের রেকর্ড। কিন্তু গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হলো গত মাসে। এত রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা ভারতের আর কোথাও নেই। গত বছর বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোট জিতেছে, কতজন মানুষ নির্বাচনোত্তর হিংসাতে মারা গেছেন? একজনও নয়। গত মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জোট

২ মে তারিখের পর থেকে রাজ্যে ৩২ জন রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন, এত মানুষ ঘর ছাড়া, এত মহিলার সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, ত্রাণ শিবিরগুলিতে করোনার আবহে এত মহিলা, শিশু নরকের জীবনযাপন করছেন। এসব কলকাতার সাংবাদিকরা কিছুই দেখেননি।

হেরে গেল। সেখানেও একজন মানুষ মারা যাননি। দেশের মধ্যে আমরাই সবথেকে সংস্কৃতিবান। তাই আমাদের বিদ্বজ্জন, সাংবাদিক, বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের বা উচ্চশিক্ষিত দেশের গর্ব যেসব উচ্চপদস্থ সরকারি আধিকারিক, কারোর লজ্জা হয় না।

সম্প্রতি বিচারের শুনানির গুরুদায়িত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন সুপ্রিমকোর্টের মহামান্য বিচারপতি ইন্দিরা ব্যানার্জি। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফল যেদিন ঘোষণা হলো, সেদিন সন্ধ্যায় শহর কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে লোহার রড দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী, তরতাজা যুবক অভিরূপ সরকারকে। সেই মামলার শুনানি থেকেই সরে এলেন বিচারপতি।

মহামান্য কলকাতা হাইকোর্ট জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে রাজ্যে নির্বাচন পরবর্তী হিংসার ঘটনার সত্যাসত্য বিচার করে বিস্তৃত রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছেন। আজকের পৃথিবীতে গণতন্ত্রের চারটি স্তম্ভ বহু চর্চিত হয়। রাজনীতি, বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যম। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেল, যে, বিচার ব্যবস্থা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের বাকি স্তম্ভগুলির কোনো শক্ত ভিত নেই।

ক্ষমতার চিটেগুড়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন যেসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, সংবাদমাধ্যমের সুবোধ বুদ্ধিজীবীরা, যেসব মহান শিল্পী 'অন্য কোথাও যাবো না' বলেছিলেন, কলকাতার যেসব উচ্চশিক্ষিত মানুষ আরবান নকশালদের ফাঁদে পড়ে #No vote for BJP বলেছিলেন তাঁরা তো এ রাজ্যে বেঁচে থাকবেন। তারা পূর্ববঙ্গের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিজেদের চোখে দেখবেন।

একমাত্র বিচারব্যবস্থায় অনুভূত হয়েছে যে বাঙ্গালির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। তাই কলকাতা হাইকোর্ট থেকে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সর্বত্র তাই আলোড়ন উঠেছে। সবথেকে লজ্জাজনক ভূমিকা নিয়েছে বাঙ্গলার সংবাদমাধ্যম। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে পালটা প্রশ্ন করা হয়েছে সাংবাদিকদের। 'আপনারা কি হিংসা দেখেছেন?' সকলে চুপ করেছিলেন। ২ মে তারিখের পর থেকে ৩২ জন রাজনৈতিক কর্মী খুন হয়েছেন, এত মানুষ ঘর ছাড়া, এত মহিলার সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে, ত্রাণ শিবিরগুলিতে করোনার আবহে এত মহিলা, শিশু নরকের জীবনযাপন করছেন। এসব কলকাতার সাংবাদিকরা কিছুই দেখেননি। কারণ তাদের কেবল এ রাজ্যের উন্নয়ন এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের দুর্নাম করার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছে। ভাবতে লজ্জা লাগে এই কলকাতা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' কাগজের সম্পাদক হরিশ মুখোপাধ্যায়ের শহর!

সবচেয়ে বেশি উপদ্রুত অঞ্চলগুলির মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার লোকসভার উদাহরণ দেওয়া সবথেকে উপযুক্ত হবে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচার হচ্ছে এখানে। ডায়মন্ডহারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণপুর, মহেশতলা, বজবজ ও মেটিয়াবুরুজ এই সাতটি বিধানসভা নিয়ে ডায়মন্ডহারবার লোকসভা। এই সবকটি বিধানসভাই রক্তস্নাত। গত লোকসভা নির্বাচনে গ্রামের পর গ্রাম থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই বর্বরোচিত ঘটনার বিবরণ জাতীয় সংবাদমাধ্যমে এসেছে কিন্তু কলকাতার বাংলা খবরে আসেনি। কোনও নৃসংশতা, কোনও অপরাধই 'এগিয়ে থাকা' সংবাদমাধ্যমের প্রভুভক্তি টলাতে পারেনি। লোকসভা ভোটের পরে শাসকদলের এক নেতার কর্মীসভার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছেন, 'কেন হিন্দুদের ভোট দিতে দেওয়া হলো?' এইসব ভয়ানক অপরাধের বিরুদ্ধে পুলিশ-প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে ধীরে ধীরে এলাকাটি মধ্যযুগীয় বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছে। একের পর এক হত্যা হয়েছে কোনো বিচার হয়নি। অপরাধী অবাধে ঘুরে বেড়িয়েছে। কেউ অভিযোগ করলে পালটা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে প্রতিবাদীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ডায়মন্ডহারবারের কথা প্রশাসনের কারো অজানা নয়। বাঙ্গালির অন্তর্জলি যাত্রার সময় এনারা ঠিক কী ভূমিকা নিয়েছিলেন সেটাও একদিন লেখা হবে। কারণ সত্য স্বপ্রকাশ। সত্যকে সকলের কাছ থেকে চিরকাল লুকিয়ে রাখতে কেউ পারেনি আর পারবেও না। বাঙ্গালির উপর নিপীড়নের কথা ইংরেজরা চাপা দিতে পারেনি, পূর্বপাকিস্তানের খান সেনারাও পারেনি, আজকের ঘটনাও একদিন প্রকাশিত হবে।

গত ৭ মে ফলতা বিধানসভার চককৃষ্ণ রামপুর গ্রামের এক প্রান্তিক চাষি সুকুমার মণ্ডল আত্মহত্যা করলেন। সুকুমার বিজেপির নেতা ছিলেন। পার্শ্ববর্তী বেনিয়াবাটি ও চককৃষ্ণ রামপুর নিয়ে ২০১ ও ২০২ নম্বর বুথ। ৬ মে বৃহস্পতিবার শাসকদলের চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের হার্মাদবাহিনী বাড়িতে বাড়িতে হুমকি দিতে থাকে। এই বুথে তাদের প্রাপ্ত ভোট কম হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে হুমকি চলছিল। মৃত সুকুমার মণ্ডল খুব গরিব। সেদিন তাকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। তার স্ত্রী ও মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বলে শাসিয়ে যায় ওই গুন্ডাবাহিনী। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ওই গরিব প্রান্তিক চাষি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন।

গত ২ মে তারিখের পর থেকে ফলতা-সহ প্রায় সবকটি বিধানসভাতেই অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। ফলতা বিধানসভার ফলতা অঞ্চলের পাচলোকী গ্রামের বছর চল্লিশের যুবক অরিন্দম পুরকাইত। পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা আর ছেলের সংসার। এক বোন, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। অরিন্দমের নেতৃত্বে গত বিধানসভা নির্বাচনে পাচলোকি গ্রামে বিজেপি এগিয়ে থেকেছে। ভোটের পরে শাসকদল আশ্রিত জেহাদি দুষ্কৃতীরা অরিন্দমকে তুলে নিয়ে যায় এবং প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করে। এরপর থেকে প্রতিনিয়ত হুমকি দিয়ে যাচ্ছিল। মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে ১৫ মে রাতে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন অরিন্দম।

২৯ মে একান্ত প্রয়োজনে সকাল ৮টার সময় ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার সাধুরহাট বাজারে আসেন রামনগর থানার নালা গ্রামের বছর তিরিশের বিজেপি কর্মী রাজু সামন্ত। শাসকদলের সমর্থকদের গণপিটুনিতে ঘটনাস্থলে ওই যুবকের মৃত্যু হয়। এই নিদারুণ ঘটনার প্রতিবাদ করতে পরের দিন ৩০ মে আশেপাশের চার পাঁচটি গ্রামের সাধারণ গ্রামবাসী একত্রিত হন। কিন্তু প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। কাউকে মারধর করা হয়নি, সরকারি বা বেসরকারি কোনো সম্পত্তির কোনো

ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সেদিনই বিকেল থেকে ওই গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। মোট ২৭ জন গ্রামবাসীকে জামিন অযোগ্য ধারাতে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই গ্রেপ্তার হওয়া প্রায় সকলেই তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষ। রাজনৈতিক কারণ চরিতার্থ করতে এই হাজতে আটকে রাখার প্রক্রিয়া বহুদিন যাবৎ এই লোকসভা এলাকায় চলছে। গত ১১ মে ডায়মন্ডহারবার জেল হেপাজতে মৃত্যু হলো স্বপন মণ্ডলের। একনিষ্ঠ বিজেপি কর্মী স্বপন মণ্ডলকে গত ৩ এপ্রিল ফলতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

৩ মে মগরাহাটের সৌরভ বর এবং ১৬ মে বিষ্ণুপুরের গৌর দাস একইভাবে নৃশংসতার বলি হয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে কেবল ডায়মন্ডহারবার লোকসভাতেই এতজন মানুষের প্রাণ গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, বীরভূম, মেদিনীপুর বা কোচবিহারের এক একটি বিধানসভা ধরে ধরে এমন অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া যায়।

৫ মে যখন মন্ত্রীসভা শপথ নিচ্ছে তখন দাউদাউ করে জ্বলছে দক্ষিণের ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, বসিরহাট, হিঙ্গলগঞ্জ থেকে উত্তরের চোপড়া, দিনহাটা। সর্বত্র একই চেহারা। ভাঙড়, গোসাবার মতো বহু জায়গায় বুলডোজার দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর হিন্দুদের ১ থেকে ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিয়ে ঘরে ফিরতে হয়েছে। অনেকটা 'জিজিয়া কর' আদায়ের মতো। যারা জরিমানা দিতে পারেনি তাদের বাড়ির মেয়ে-বউদের কয়েক ঘণ্টার জন্য নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই অসম্ভব লজ্জার কথা শত শত মানুষ বলতে পারেননি। কিন্তু অনেক সাহসী হিন্দু এফআইআর করেছেন, ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা করিয়েছেন। এই সাহস বাঙ্গালি হিন্দুর অন্তর্জলি যাত্রার পথে একমাত্র আশার আলো।

মানিকতলা বিধানসভার অভিজিৎ সরকার। বছর পঁয়ত্রিশের ছেলেটি কলকাতা পৌরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। একদম তরতাজা প্রাণবন্ত ছেলে। রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরকে, বেড়ালকে খুব ভালোবাসত। বস্তির বাড়ির মধ্যেই একটা ছোট্ট এনজিও করেছিল। এবার নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক কল্যাণ চৌবের সমর্থনে খুব খেটেছিল অভিজিৎ। ২ তারিখে ফল প্রকাশ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তার বাড়ি আক্রান্ত হলো। তার এনজিও ঘরে রাখা কুকুরের চোট্ট বাচ্চাগুলোকে পিটিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে আক্রমণকারীরা। সেই মর্মান্তিক কাহিনিই সে ফেসবুক লাইভ করে জানাচ্ছিল। কিন্তু আরও মর্মান্তিক পরিণাম যে তার জন্য অপেক্ষা করছে, তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে অভিজিৎ তো মুক্তি পেয়ে গেছে। কারণ পশ্চিমবঙ্গেও দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে পূর্ববঙ্গের বাস্তব। আজকের ক্ষমতার চিটেগুড়ে লুটোপুটি খাচ্ছেন যেসব রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী, সংবাদমাধ্যমের সুবোধ বুদ্ধিজীবীরা, যেসব মহান শিল্পী 'অন্য কোথাও যাবো না' বলেছিলেন, কলকাতার যেসব উচ্চশিক্ষিত মানুষ আরবান নকশালদের ফাঁদে পড়ে #No vote for BJP বলেছিলেন তাঁরা তো এ রাজ্যে বেঁচে থাকবেন। তারা পূর্ববঙ্গের ঘটনার পুনরাবৃত্তি নিজেদের চোখে দেখবেন। রাজশাহীর ইলা মিত্রের ঘটনা, চট্টগ্রামের নাজিরহাট কলেজের অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরীর হত্যার মতো ঘটনা নিজেদের চোখে দেখবেন। বাড়ির দালানের থামে পুরুষদের বেঁধে এক এক করে চোখের সামনে মেয়েদের গণধর্ষিতা হতে দেখে পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা এপারে পালিয়ে এসেছেন। ছটফটে অভিরূপকে আর এইসব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে হবে না। ও অবোলা পশুদের সেবা করত, মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াত, তাই ভগবান পশুপতিনাথ ওকে এসবের আগেই নিজের কাছে ডেকে নিয়ে গেছেন। □

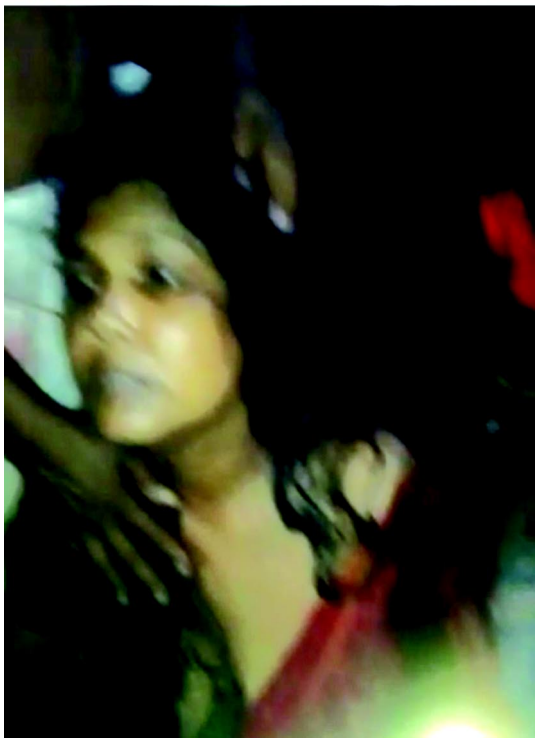

পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হলে কেন্দ্রকে এই মুহূর্তে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই হবে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভারতে ২৯টি রাজ্যের মধ্যে কোনো রাজ্যে ভোটের আগে বা পরে শাসকদলের মদতে বিরোধীদের ওপর বিশেষ করে বিজেপি দলের সমর্থক, কর্মী, নেতা, বিধায়ক মায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওপর আক্রমণ করার নজির আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই সমস্ত ঘটনাবলী গুনে শেষ করা যাবে না। শুধু ব্যক্তি আক্রমণ নয়, এর সঙ্গে রয়েছে লুটপাট, গৃহদাহ, মারধোর, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও গণহত্যা। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় শাসক সুপ্রিমো রাজ্যের এবং বাংলাদেশ থেকে জেহাদি সন্ত্রাসীদের ডেকে এনে হিন্দুদের ওপর আক্রমণ করার উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন। না, একথা আমার নয়। গ্রামেগঞ্জের, শহর-নগরের বহু সাধারণ হিন্দুদের কথা।

বর্তমানে রাজ্যে যে পরিস্থিতি চলছে তা দেখে মনে হচ্ছে গত শতাব্দীর ছেচল্লিশের ১৬-১৮ আগস্ট কলকাতায় এবং ২০ অক্টোবর থেকে সপ্তাহব্যাপী নোয়াখালির পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। সে সময় রাজ্যের ক্ষমতায় থেকে মুসলিম লিগের প্রিমিয়ার সোহরাবর্দি পাকিস্তান আদায়ের জন্য পরিকল্পিতভাবে হিন্দুহত্যা করেছিলেন। তা করতেই পারেন। কেননা তাদের পবিত্র কোরানেই বলা আছে অমুসলমানদের ধন-সম্পদ লুট করা, নারী ধর্ষণ করা এবং হত্যা করা অপরাধ নয় বরং পুণ্যের কাজ। যারা একাজ করবে তারা বেহেস্তে গিয়ে শত শত হুরি নিয়ে দিন যাপনের লাইসেন্স পাবে পরম দয়ালু খোদাতাল্লার কাছ থেকে। কিন্তু বর্তমান শাসক সুপ্রিমো তো ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন? আমরা জানি তিনি দরিদ্র ঘরের এক ব্রাহ্মণ কন্যা। তাহলে তিনি কেন হিন্দু হত্যায় মেতে উঠলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই বলে থাকেন এবং পত্র-পত্রিকাতেও দেখা যায়— 'তিনি হলেন অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী ও একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর প্রধান আকঙ্ক্ষা দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া। কিন্তু তিনি তা হতে পারবেন না। কারণ ভারতের মতো বিশাল দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে গেলে শুধুমাত্র ২০-৩০ বা ৪০ জন সাংসদ নিয়ে

> মোদীজীর এই মুহূর্তে প্রধান ও প্রথম কাজ এ রাজ্যের হিন্দুদের রক্ষা করা। সেজন্য যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

প্রধানমন্ত্রী হওয়া যাবে না। এটা তিনি ভালো করেই জানেন। তাই এই রাজ্যটাকেই যদি আলাদা দেশ তৈরি করা যায় তাহলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ হতে পারে।

তিনি যে এই রাজ্যটাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান তার বহু নজির তিনি রেখেছেন। দুর্বৃত্ত বামফ্রন্ট সরকারকে সরানোর জন্য রাজ্যের হিন্দু-মুসলমানরা দু' হাত উজাড় করে ভোট দিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় এনেছিলেন। কিন্তু এসেই তিনি শুরু করলেন তোষণ নীতি। মুসলিমরা যতকিছুই অপরাধ করুক সাতখুন মাপ। শুধু মাফ নয়, 'বাচ্চা ছেলে', 'ছোটো ছেলে' বলে তাদের বেশি করে অপরাধ করার জন্য উৎসাহ জুগিয়ে চললেন। অন্যদিকে ধর্ষিতাকে চরিত্রহীনা বলে দেগে দিলেন। এই বাচ্চা ছেলেরা রাজ্যে একের পর এক হিন্দুদের হত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, গ্রামেগঞ্জে হিন্দু বাড়িতে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ অবাধে করে গেলেও তাদের কোনো শাস্তির মুখে পড়তে হয়নি। পক্ষান্তরে হিন্দুরা এসমস্ত কাজের প্রতিবাদ করলেই তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে জেলে ভরা হয়েছে। আবার পুলিশ যদি কোনো 'দুধেলগোরু' অপরাধীকে গ্রেপ্তার করেছে তাহলে সেই পুলিশ অফিসারকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যটাকে একেবারে অসভ্য ও বর্বরের রাজত্বে পরিণত করা হয়েছে। দুর্বৃত্ত বামফ্রন্ট ৩৪ বছরে রাজ্যের হিন্দুদের যত না ক্ষতি করেছে এই সরকার ১০ বছরে তার কুড়ি গুণ বেশি ক্ষতি করেছে হিন্দুদের। এবং আগামী পাঁচ বছরে আরও যে কত ক্ষতি করবে তা ভাবতে গেলেই শিউরে উঠতে হচ্ছে।

যে সমস্ত হিন্দু তৃণমূল সরকার গঠনের পর আনন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করে চলেছেন এবং বিজেপি সমর্থকদের মারধোর ও গালাগালি করছেন, তারা কি ভেবে দেখেছেন যে, আপনারা আপনাদের ভবিষ্যৎ কোথায় নিয়ে চলেছেন? তাহলে কয়েকটি ঘটনা এবং দেশভাগের ইতিহাসের কিছু ঘটনা আপনাদের জানিয়ে রাখি।

১। দেশভাগ হয়েছিল জওহরলাল নেহরু

ও মহাত্মাগান্ধীর তীব্র জিন্না তোষণ এবং কমিউনিস্টদের মেলবন্ধনে।

২। কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা জিন্নার দাবি মতো সমগ্র বঙ্গ প্রদেশ এবং পঞ্জাব প্রদেশ জিন্নার হাতে তুলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পঞ্জাবের কিছু অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গকে জিন্নার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে শুধুমাত্র হিন্দুদের বসবাসের জন্য এই পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন। মুসলমানদের দাপাদাপি এবং সন্ত্রাস চালানোর জন্য নয়।

৩। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে শুধু পশ্চিম পঞ্জাবেই হত্যা করা হয়েছিল মাত্র ৬ লক্ষ হিন্দুকে। কীভাবে হত্যা করা হয়েছিল তার বিবরণটা একটু দেখে নিন। "...6,00,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were picked up by the feet and their heads smashed against the wall. It they were girls, they were raped and their breasts were choppedoft. And if they were pregnant, they were disembowelled.'' অর্থাৎ শিশুদের শূন্যে তুলে পা ধরে দেওয়ালে আছাড় মেরে মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বালিকা-তরুণীদের ধর্ষণ করে তাদের স্তন কেটে নেওয়া হয়েছিল। গর্ভবতীদের গর্ভপাত করে দেওয়া হয়েছিল।' মনে রাখবেন এটা আমার বানানো কথা নয়। এ তথ্য লিখে গেছেন— Leonard Mosley : p. 279।

আরও আছে— সরকারি হিসেবে নিহত ৬ লক্ষ; গৃহহারা ১ কোটি ৪০ লক্ষ; ধর্ষিতা নারী ১ লক্ষ; ধর্মান্তরিত বা নিলামে যে কত মেয়েকে বিক্রি করা হয়েছিল তার কোনো সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি। পূর্ব পাকিস্তানের হিসেবেও কম কিছু নয়।

দেশভাগের সময় থেকে পূর্ব পাকিস্তানে এমনকী পরবর্তীতে বাংলাদেশ হওয়ার পরেও সেখানে সমানতালে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চলছে। দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২৯ শতাংশ। বাংলাদেশ হওয়ার সময় হিন্দুর সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯ শতাংশে। আর ২০১৯-এর হিসেবে বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮ শতাংশে। তাহলে এরা গেল কোথায়? এর উত্তর হলো— কিছু ভারতে এসেছে, কিছু ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং বহুজনকে হত্যা করা হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে লাথ খেয়ে আসা হিন্দুদের পরবর্তী প্রজন্ম এবং পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী বাসিন্দা হিন্দুরা যেন একথাগুলি মনে রাখেন। তাতে তাদেরই মঙ্গল হবে। দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে জিন্নার গুন্ডাদের হাতে ধন-সম্পদ মান-সম্ভ্রম হারিয়ে একবস্ত্রে এসে পশ্চিমবঙ্গে মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ হওয়ার পরেও যারা ওখান থেকে প্রাণ হাতে করে এসেছেন তাঁদেরই উত্তরসূরি এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় কিছু লোভী, বিকৃত মনস্ক রাজনীতিক এবং বজ্জাত বুদ্ধিজীবীরা মিলে পশ্চিমবঙ্গকে পুনরায় জিন্নার প্রেতাত্মাদের হাতে তুলে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। তারই ফলস্বরূপ গত দু'বছর থেকে সদ্য ভোট শেষ হওয়ার পরও এখানে হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার ও গণহত্যা শুরু করেছে।

সুদূর কানাডা, আমেরিকা, কুয়েৎ থেকে সেখানকার প্রবাসী হিন্দুরা পথে নেমে পশ্চিমবঙ্গের হিংসার প্রতিবাদ করছেন। তাঁদের সেই প্রতিবাদ প্ল্যাকার্ডে লেখা আছে— Killings Rapes & Lootings. Who will save Hindus of West Bengal. কেউ লিখেছেন— Communist Mamata is a threat to the Democracy. Mamata–Stop Hindu Killing, stop Raping Hindu. কোথাও লেখা আছে— Human Rights staughtered in West Bengal. আর একদল লিখছেন— Save Bengal. Please Save Hindus from TMC Atrocities. কোনো প্ল্যকার্ডে লেখা রয়েছে— We have vaccine Against Corona. We need Vaccine Against Mamata Because Hindulives Matter.

Mamata Banerjee–Stop Killing, Raping of Hindus. Stop Hindu Genocide. Indo–Canadions Demand–Strong Action From the Govt. of India. এইভাবে এ রাজ্যের হিন্দু গণহত্যার প্রতিবাদ বিদেশে হলেও রাজ্য সরকার বেমালুম তা চেপে যাচ্ছে। এটাই দুঃখের।

এই মুহূর্তে রাজ্যের যা পরিস্থিতি তাতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে সেনা নামিয়ে হিংসা বন্ধ করা উচিত। এখানে এখন ১৯৮৯ সালের কাশ্মীরের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছয় মাস অন্তর অন্তর রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বাড়িয়ে তিন বছর পর্যন্ত তা লাগু রাখা প্রয়োজন। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি, সন্ত্রাসী তৈরির কারখানাগুলি ধ্বংস করে দিতে হবে। তিন বছরের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় জমি অধিগ্রহণ করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। ভোটারলিস্ট থেকে ভুয়ো এবং অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ দিয়ে সঠিক ভোটার লিস্ট তৈরি করতে হবে। আর সংঘটিত অপরাধীদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির মেয়র তথা সিপিএমের গুরুত্বপূর্ণ নেতা অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন— '১৯৮০ সাল থেকে প্রায় দেড় কোটি বাংলাদেশি মুসলমান রাজ্যে ঢুকে হিন্দু নামে ভোটার লিস্টে নাম তুলেছে।' এতদিন পরে অশোকবাবু স্বীকার করলেন, অনুপ্রবেশকারীদের সবরকম সাহায্য তাঁরাই করে গেছেন। ভোটে সিপিএম গোহারার পর আসল তথ্য তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

১৯৯২ সালে অযোধ্যার বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহ নিজে থেকেই পদত্যাগ করেছিলেন ধাঁচা রক্ষা করতে পারেননি বলে। কল্যাণ সিংহ পদত্যাগ করার পরও নরসিংহরাও সরকার শুধু উত্তরপ্রদেশ সরকারকে বরখাস্ত করেননি, তার সঙ্গে বিজেপি শাসিত আরও তিনটি রাজ্য সরকারকে বরখাস্ত করেছিলেন। ওই তিনটি রাজ্য সরকার তো কোনো অপরাধ করেনি? তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সরকারি মদতে অরাজকতা ও হিন্দু গণহত্যা চলছে তার বিরুদ্ধে কেন্দ্র সরকার কেন কড়া ব্যবস্থা নেবে না? কেন্দ্র সরকার জনগণের এই দাবি এড়িয়ে যেতে পারে না। দেশের সমস্ত রাজ্যের হিন্দুরা প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর উপর পূর্ণ আস্থা রাখেন যে, তিনি অন্তত এ রাজ্যের সরকারকে ইচ্ছে মতো হিন্দু হত্যা করার অধিকার দেবেন না। হিন্দুরা আরও আশা করেন যে, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে রাজ্যে যত হিন্দুদ্রোহী ও দেশদ্রোহী উৎস আছে সবগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হোক।

রাজনীতিতে ভালো মানুষের কোনো জায়গা নেই। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ভালোমানুষি এবং জওহরলাল নেহরুর মতো বজ্জাত রাজনীতিকদের জন্য দেশ একবার খণ্ডিত হয়েছে। পুনরায় এই দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করার যে চেষ্টা চলছে তা অস্বীকার করা যাবে না। কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের হাত করে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীরা ভারতকে পুনরায় টুকরো টুকরো করার খেলায় নেমেছে। এখনই যদি এদেরকে ঠাণ্ডা করা না যায় তাহলে আর কোনোদিন সে সুযোগ মোদীজী পাবেন না।

মোদীজীর নিকট রাজ্যবাসীর কাতর প্রার্থনা— তিনি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের রক্ষা করুন। মোদীজীরও এই মুহূর্তে প্রধান ও প্রথম কাজ এ রাজ্যের হিন্দুদের রক্ষা করা। সেজন্য যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে। নচেৎ পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। ■

আক্রমণের শিকার পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানাচ্ছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়

পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ হিংসায় রাজ্য প্রশাসন ও সংবাদমাধ্যম নীরব

অগ্নিশিখা নাথ

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায়। নির্বাচন হলো যে কোনো গণতান্ত্রিক দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার, কিন্তু এবারের নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে যে ভয়াবহ পৈশাচিকতার শিকার হতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙ্গালিকে তাকে শুধু রাজনৈতিক হিংসা আখ্যা দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুরা শহর গ্রাম নির্বিশেষে এই সন্ত্রাসের শিকার। বনবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিও এর বাইরে নয়। ২০২১-এর ২ মে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরই শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীবাহিনী হামলা চালায় হিন্দুদের বাড়িতে। পুরুষদের ওপর চলে মারধোর, তাদের বাড়িছাড়া করা হয়। মহিলাদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার। শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, গণধর্ষণ এবং কিছু কিছু জায়গায় হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। হাজার হাজার বাড়ি ভাঙা হয়েছে, লুঠ হয়েছে টাকাপয়সা-সহ গৃহকর্তার শেষ সম্বলটুকুও। বনবাসী অধ্যুষিত বেশ কিছু জায়গায় বিশেষ করে গোসাবা, সন্দেশখালি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বনবাসী হিন্দুদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ আগ্নেয়াস্ত্রধারী মুসলমান সম্প্রদায়ের একদল গুন্ডা ঘরের বাচ্চা বুড়োর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মহিলাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে এলাকার ক্লাব ঘরে। দু-তিন ঘণ্টা পর ফেরত দিয়ে যাচ্ছে।

সন্দেশখালিতে একটি ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েকে সকলের সামনে উলঙ্গ করে, গণধর্ষণ করা হয়। মেয়েটির বাবাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে মারধর করে। মেয়েটির মাও ধর্ষণের শিকার। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এইসব এলাকায় এই ধরনের পৈশাচিক অত্যাচার চলছে নিরন্তর। গোসাবায় একদিনে ২০০টি বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাসিন্দারা সব গ্রামছাড়া। মোটা টাকার চাহিদা এবং গৃহবধূর সঙ্গে সহবাস করার বিনিময় পুরুষদের ঘরে ফিরতে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। গত ১৯ মে রাত ১টায় সোনারপুর উত্তর বিধানসভার খেয়াদা ২নং পঞ্চায়েত রুমঝুম পার্কের চাকদা এলাকার নির্মল মণ্ডলকে (৪৯ বছর) তাঁর বাড়িতে এসে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বাঁশ ও লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে নৃশংসভাবে খুন করে। উনি ভারতীয় জনতা পার্টির দক্ষিণ ২৪ পরগনার (পূর্ব) জেলার, নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত সোনারপুর উত্তর বিধানসভার তফশিলি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। অভিযোগ, ভোট পরবর্তী হিংসায় এই দুষ্কৃতীদের ভূমিকায় রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট রোহিঙ্গাদের একটি বিশেষ ভূমিকা লক্ষ্য করার মতো। এবং আরও একটি বিষয় উঠে এসেছে যে, ভোট পরবর্তী যে সন্ত্রাস তা সম্পূর্ণরূপে পূর্বপরিকল্পিত কারণ আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক পদার্থ— এগুলির জোগান এত মাত্রায় এলো কীভাবে? তবে এই পুরো বিষয়টিতে আরও একটি বিন্দু অত্যন্ত লক্ষণীয় যে, রাজ্য সরকারের তাবেদারি করা প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমগুলি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমানের এই ভয়াবহ অসাংবিধানিক পরিস্থিতিকে ক্যামেরাবন্দি করছে না কোনওভাবেই এবং প্রশাসনের ভূমিকাও এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে নিষ্ক্রিয়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ভয়াবহ অসাংবিধানিক পরিস্থিতিকে রাজ্যের প্রথম শ্রেণীর সংবাদমাধ্যমগুলি ক্যামেরাবন্দি করছে না কোনওভাবেই এবং প্রশাসনের ভূমিকাও এখানে উল্লেখযোগ্যভাবে নিষ্ক্রিয়।

শিক্ষার অপূরণীয় ক্ষতি

বিশ্বজুড়ে অতিমারি পররিস্থিতিতে জীবন জীবিকা চরম ক্ষতির সম্মুখীন। বেঁচে থাকাটাই মানুষের কাছে এখন প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঁচার তাগিদে মানুষ সবকিছু করতে প্রস্তুত। ভাবীকাল কী নিয়ে দণ্ডায়মান তা এখনো বোধগম্যের অতীত। অধিকাংশ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সভ্যতার গতি আজ দিশেহারা। এহেন অবস্থায় মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে সরকার হিমসিম খাচ্ছে। মনে রাখতে হবে মানুষের অন্যতম চাহিদা হলো শিক্ষা। তাই শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

প্রায় পনেরো মাস যাবৎ শিক্ষা ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছে। শিক্ষাঙ্গন ছাত্র-শিক্ষক সঙ্ঘ বঞ্চিত। বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কক্ষগুলিতে বাড়ছে ঝুলের মাত্রা। বিদ্যালয়ের গেট-আপগুলি দেখে মনে হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে থাকার কারণে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত। তাদের এই মানসিক ক্ষতিটা মেনে নিতে পারছে না। অথচ নিরুপায়। যারা কিছু করতে পারে তাদের প্রতি চেয়ে থাকা ছাড়া অন্য গতি নেই। অনেকেই করোনার দোহাই দিয়ে বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন। এখানে বলা যেতে পারে, জীবনের অন্যান্য চাহিদাগুলি যদি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে পারে, তবে শিক্ষা শুধু ব্রাত্য থাকবে কেন? ছাত্র-ছাত্রীদের দিকটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না কেন? ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছি না কেন? যারা আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পদ তাদের উপেক্ষা করছি কেন? এধরনের অনেক জিজ্ঞাসা আমাদের মনে আসাটা স্বাভাবিক। সমস্যা যেমন আছে, তেমনি তার সমাধানও আছে। আমরা শুধু সমস্যা নিয়ে ভাবছি, আলোচনা করছি। কিন্তু সমাধানের রাস্তা খুঁজছি না। খুঁজলে অবশ্য একটা উপায় বের হয়ে আসতো। কারো প্রতি দোষারোপ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, ক্ষতির মাত্রা বেড়ে গেলে তা পূরণ করার আর উপায় থাকবে না। ভাবার আর অবকাশ নেই, এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কোভিডবিধি মেনে প্রথমে উচ্চস্তরে পরে মধ্য এবং নিম্নস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থাকে চালু করতে হবে, এটা বোধহয় অধিকাংশ অভিভাবকই চাইছেন।

শিক্ষকদের গৃহবন্দি হয়ে দিন না কাটারই কথা। কর্ম না করে বেতন নেওয়ার সামাজিক অপবাদটাকেও তাঁরা হজম করতে পারছেন না। শিক্ষকদের আনন্দ শিক্ষাদানে। সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনে শিক্ষকরা কখনোই পিছিয়ে থাকেনি। যেখানে সম্ভব, অনলাইনের মাধ্যমে কিছুটা হলেও শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ তাঁরা অবশ্যই করেছেন। অধিকাংশ শিক্ষকরাই তাঁদের কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত। শুধুমাত্র উপযুক্ত সরকারি ব্যবস্থার অপেক্ষায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে কোভিডবিধি সচেতনতা সৃষ্টি করে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরির নির্দেশিকা শিক্ষা দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা সমর্থক হতে হবে।

রাজনৈতিক স্বার্থ ও প্রভাব মুক্ত হয়ে শিক্ষাকে করোনা-রাহুর গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে। সরকার মনে করলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের ধরনধারণ ঠিক করতে পারেন। বিদ্যালয় খোলা শুরু হলে ছাত্র- ছাত্রীদের মধ্যে জমে থাকা মানসিক অবসাদ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে।

—মনোরঞ্জন মণ্ডল,
নক্সালবাড়ি, শিলিগুড়ি।

রাজনৈতিক সাফল্য ছাড়া বাঙ্গালি হিন্দুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার

খুব ভালো লাগলো স্বস্তিকার শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যাটি পড়ে। অনেক তথ্যসমৃদ্ধ। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও বাঙ্গালি হিন্দুদের হোমল্যান্ড অর্জনের উপাখ্যান থেকে তিনটি জিনিস শেখার আছে।

১। শ্যামাপ্রসাদ আগে শিক্ষাবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরে বৃহত্তর স্বার্থে রাজনীতির আঙিনায় পা দিয়েছিলেন। বড়ো কোনও আদর্শকে বাস্তবের রূপদান করতে গেলে শিক্ষার ভিতটা মজবুত হওয়া দরকার। বাগ্মিতা জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আসে, চটুল ভাষা থেকে নয়। এখন ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে ভোটে জিততে হয় পেশিশক্তি না হলে আর্থিক শক্তি লাগে। শিক্ষার কোনও মূল্য নেই। পার্টিও এই দুদিক বিচার করেই প্রার্থী নির্বাচন করে। তাই আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে আর কোনও শ্যামাপ্রসাদ পাওয়া যাবে না।

২। শ্যামাপ্রসাদকে রাজনীতিতে আসতে হয়েছিল কারণ তিনি বুঝেছিলেন, শাসন ক্ষমতায় থাকা মুসলিম লিগের সঙ্গে শুধু সামাজিক ও তাত্ত্বিক ভাবে বিরোধিতা করে কিছুই পাওয়া যাবে না। ধরি মাছ না ছুঁই পানি অবস্থান থেকে সরে না এলে বর্তমান নেতৃত্বে হিন্দু বাঙ্গালির হোমল্যান্ড সুরক্ষিত রাখার রাস্তায় খুব বেশি দূর এগোনো যাবে না। এই রাজ্যের বিজেপির রাশ সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে নিতে হবে নতুবা অন্য কোনও পন্থা নিতে হবে। রাজনৈতিক সাফল্য ছাড়া বাঙ্গালি হিন্দুদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

৩। শ্যামাপ্রসাদ ফজলুল হকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে মুসলিম লিগকে ক্ষমতাচ্যুত করার পথে এগোতে পেরেছিলেন কারণ সুভাষ বোসের মতো একজন বলিষ্ঠ নেতার জন্য। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁর মতো একজন বাঙ্গালি প্রতিনিধি সেই সময়ের প্রবল পরাক্রমশালী কংগ্রেস, গান্ধীজী ও জিন্নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই 'বাঙ্গালি হিন্দুদের মুক্তি কোন পথে' এই নিয়ে স্বস্তিকার কোনও একটি সংস্করণ বাস্তবায়িত হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম।

—সোমনাথ গোস্বামী,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

রাজনৈতিক সৌজন্য

সদ্য অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

নির্বাচনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার হাড়নপুর (সদর) কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছেন রুপালি পর্দায় জনপ্রিয় অভিনেতা ও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, দর্শক মহলে 'হিরণ' নামে যিনি সমধিক পরিচিত। এই পত্রের মূল বক্তব্য যাবার আগে খড়্গপুর (সদর) কেন্দ্র সম্বন্ধে মুখবন্ধ করে নেওয়া প্রয়োজন, তা নাহলে পাঠক এই পত্রের উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবেন না। এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন (১৯৭২-২০১৬) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দখলে ছিল এবং এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন প্রয়াত জ্ঞান সিংহ সোহনপাল। একদা খড়্গপুর এবং জ্ঞান সিংহ সোহনপাল যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল। বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের রাজত্বেও তিনি কখনও পরাজিত হননি। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে জ্ঞান সিংহ সোহনপালকে পরাজিত করে ইতিহাস রচনা করেন ভারতীয় জনতা দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর সংসদীয় কেন্দ্র থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীকালে তিনি বিধায়ক পদ ত্যাগ করেন। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে খড়্গপুর (সদর) বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হয় এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বাইশ হাজারেরও বেশি ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীকে পরাজিত করে জয়ী হন।

খড়্গপুর (সদর) কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী মনোনীত করে জনপ্রিয় অভিনেতা হিরণকে। রাজ্যের শাসক দলের দখলে থাকা এই কেন্দ্রে এবারের লড়াই ছিল অত্যন্ত কঠিন। প্রার্থী ঘোষণার পরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে হিরণ কেন্দ্রের প্রতিটি মহল্লায় পৌঁছে নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে ভারতীয় জনতা পার্টির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং তাদের সমর্থন প্রত্যাশা করেন। পরিষদীয় রাজনীতিতে নবাগত হয়েও হিরণ একজন পরিণত রাজনীতিবিদের মতো নির্বাচনী আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং ২ মে তার নিরলস পরিশ্রমের সাফল্য অর্জন করেন। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে হিরণ গণনাকেন্দ্রে খড়্গপুর (সদর) কেন্দ্রের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিরসনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থীর পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করেন। হিরণের এই ভূমিকা বাঙ্গলার অশান্ত বাতাবরণে এক সুস্থ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আশা করব, খড়্গপুর (সদর) কেন্দ্রের আপামর জনসাধারণের কল্যাণে হিরণ সতত নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন। রুপালী পর্দায় তার অনবদ্য অভিনয়ে যেরকম দর্শকরা মুগ্ধ হয়, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিধায়ক হিসেবেও তাঁর পরিষেবায় নির্বাচক মণ্ডলী খুশি হবেন।

—সপ্তর্ষি ঘোষ,
৫৭, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট, কলকাতা-৯।

নতুনদের জায়গা ছেড়ে দিন

জ্যোতি বসুর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে দেখা গেল বিমানবাবুকে। মার্কসীয় নেতৃবৃন্দের অবসর বলে কিছুই নেই। ব্যর্থ পরিকল্পনার জন্য, দলের সখাতসলিলে যাওয়ার পরও অবসর নেওয়া উচিত বলে মনে করে না। হয়তো দলকে দধীচির ন্যায়, অস্তিত্বহীন করে দেওয়ার জন্য কোনো বৃহত্তর পরিকল্পনা আছে। কিন্তু প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে লজ্জায় ও ঘৃণায়, রাজনীতি ও সংসার জীবন ত্যাগ করে বৈরাগী হয়ে যেতেন। দুঃখের কথা, সঙ্ঘ ও সঙ্ঘ থেকে আসা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরাও একই পথের পথিক। নতুন কে ঠাঁই করে দিতে আমাদের ত্যাগ করার মানসিকতার বড়োই অভাব আজও রয়ে গেছে বলে মনে হয়। মুকুট পরা শক্ত, ত্যাগ করা আরও অনেক বেশি কঠিন।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর পূর্ব মেদিনীপুর।

পাটলিপুত্র ও পাটনা নামের উৎস

বিহার রাজ্যের রাজধানী পটনা বা পাটনা গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থান করছে। বর্তমান পাটনা স্টেশন থেকে পশ্চিম-উত্তরে বারো-তেরো কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে ইতিহাসের পাটলিপুত্র। আজ থেকে প্রায় ২ হাজার ৫০০ বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জীবনকালে মগধরাজ অজাতশত্রু গঙ্গা ও শোন নদের সঙ্গমস্থল পাটলিগ্রামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। পাটলিফুল বা পাটলিগাছ অধ্যুষিত গ্রাম, তাই নাম পাটলিগ্রাম। এক কথায় পাটলির গ্রাম। এরপর অজাতশত্রুর পুত্র উদায়িন রাজা হয়ে পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ থেকে পাটলিগ্রামে নিয়ে আসেন। নামকরণ হয় পাটলিপুত্র। উল্লেখ্য, পাটলিফুলগাছগুলো অঞ্চল জুড়ে প্রাকৃতিক শোভা বর্ধন করতো। পর্যটক মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন, হিউএনসাং পাটলিপুত্রের সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। এই সৌন্দর্যের বড়ো কারণ ছিল সুন্দর পাটলিফুল। তাই সংশ্লিষ্ট স্থানকে পাটলি ফুলের সন্তান মনে করা হতো। তাই নাম হয় পাটলিপুত্র। প্রসঙ্গত, প্রাচীন পুণ্ড্রর কথা বলতে হয়। পদ্মার উত্তরদিকের ভূখণ্ড পুণ্ড্রু নামে পরিচিত ছিল। এখানে পদ্মার পুত্র অর্থে পুণ্ড্রু নাম হয়েছিল। এভাবেই এক কথায় পাটলির পুত্র—পাটলিপুত্র।

পাটনা : একাংশের মতে 'পাটলি'র বিবর্তিত নাম 'পটনা'। অন্যমতে এখানে গঙ্গাতটে বাণিজ্যিক পণ্য জাহাজে আদান প্রদান হতো। এরূপ স্থানকে সংস্কৃত ভাষায় পট্টন বলে। এই পট্টন হিন্দি উচ্চারণে পাটনা হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, পাটলিপুত্রের গুরুত্ব কমে যাওয়ায় পট্টন বা পাটনার গুরুত্ব বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পাটলিপুত্র ইতিহাসের পাতায় চলে যায় এবং পাটনা ভূগোলের পাতায় চলে আসে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

With Best Compliments from :

A Well Wisher

অসীম আকাশে শ্রীমতী ইন্দু জৈন

সুতপা বসাক ভড়

টাইমস অব ইন্ডিয়ার সভাপতি শ্রীমতী ইন্দু জৈন অতি সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ জীবন আধ্যাত্মিকতায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। তিনি ছিলেন কলা, সংস্কৃতির একজন উচ্চমানের ব্যক্তিত্ব ও পৃষ্ঠপোষক। মহিলাদের উন্নতিকল্পে তাঁর অবদানকে দেশবাসী সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করবে। প্রখর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি সর্বদা মাটির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সূত্র বজায় রেখেছেন। তাঁর জগৎকল্যাণকারী বহুমুখী প্রতিভার জন্য সবাই তাঁকে মনে রাখবে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার মতো একটি সংবাদমাধ্যমের কর্ণধার হয়েও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক থেকে শুরু করে তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং গুণমুগ্ধ মানুষজন তাঁর মধ্যে তারুণ্যের যে উৎসাহ, জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব এবং সব মিলিয়ে বিশ্বকে আরও সুন্দর, প্রাণবন্ত করে তোলার যে প্রচেষ্টা তাকে সম্মান জানিয়েছেন।

প্রথম সাক্ষাতে মানুষ তাঁর মধ্যে একটি অপার্থিব জ্যোতি দেখতে পেতেন। শিশুসুলভ তাঁর স্মিত হাস্যমুখে প্রকাশ পেত আধ্যাত্মিক জ্যোতি। ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তিনি। হিন্দি, ইংরেজিতে সাবলীল ছিলেন। এছাড়াও তিনি বাংলা, ভোজপুরী, অবধী এবং আরও বেশ কিছু ভাষায় অবলীলায় কথোপকথন করতেন।

১৯৯৯ সালে তিনি যখন টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপের সভাপতি নিযুক্ত হন, তখন তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতিতে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন, যা ওই সংস্থাটিকে একটি উচ্চতায় নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। ২০০০ সালে তিনি দ্য টাইমস ফাউন্ডেশন স্থাপনা করেন। এটি সামাজিক কার্যে সর্বদা অংশগ্রহণ করেছে এবং টাইমস রিলিফ ফান্ডটি ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, মহামারীর মতো প্রাকৃতির বিপর্যয়ের সময় মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীমতী ইন্দু জৈন এফআইসিসিআই লেডিজ অর্গানাইজেশন (এফএলও)-এর প্রতিষ্ঠাত্রী এবং প্রথম অধ্যক্ষা। মহিলাদের পেশাগত ভাবে নতুন কিছু তৈরি করা এবং তাঁদের মধ্যে পেশাগত উৎকর্ষতাকে উৎসাহ দেবার জন্য এই সংস্থাটির স্থাপনা করেন। এছাড়াও ১৯৯৯ সাল থেকে তিনি ভারতীয় জ্ঞানপীঠ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ছিলেন, যা তাঁর শ্বশুরমশাই সাহু শান্তি প্রসাদ জৈন ১৯৪৪ সালে স্থাপনা করেছিলেন। ভারতীয় ভাষাগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ প্রদান হলো এই ট্রাস্টের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানে প্রত্যেক বছর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ভারতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট রচনার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, তা সাহিত্য প্রেমীদের কাছে সব থেকে বড়ো সম্মান। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ছিল অঙ্গদান, কিন্তু কোভিডের জটিলতার জন্য তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তিনি জীবদ্দশায় অনেক সম্মান পেয়েছেন। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হন। ২০১৯ সালে তিনি Institute of Company Secretaries of India-র পক্ষ থেকে Lifetime Achievement পুরস্কার পান। ২০১৮ সালে All India Management Association তাঁকে Lifetime Contitution to Media পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত করে। এছাড়াও ২০০৯ সালে Indian Congress of Women-এর পক্ষ থেকেও তাঁকে Lifetime Achievement Award দ্বারা ভূষিত করা হয়। ২০০০ সালে তিনি Millennium World Peace Summit-এ (United Nation) তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

সবার প্রতি বিশেষেত তরুণদের প্রতি ছিল তাঁর মার্মিক আবেদন— 'দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে আধ্যাত্মিকতাকে কখনও বিচ্ছিন্ন করো। না।' তিনি বলেছেন বাহ্যিক উন্নতি ও কৃতিত্বের সঙ্গে আন্তরিক উন্নতির অবশ্যই সমন্বয় উচিত। মহিলাদের ক্ষমতার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখে বলেছেন যে, মহিলাদের যদি একটি সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই, বিশেষ কোনো প্রচেষ্টা ছাড়াই অহিংসা হবে আগামী যুগের ধর্ম। তাঁর মধ্যে যে শিশুসুলভ কৌতূহলী মন ছিল, তা তাঁকে একজন অন্বেষক রূপে পরিগণিত করেছে।

একটি প্রতিষ্ঠানের শীর্ষে থাকা সত্ত্বেও তিনি আধ্যাত্মিক পথে দৃঢ়ভাবে থেকেছেন, সৎসঙ্গের আয়োজন করে শান্তি, মানবতাবাদ, প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সংঘাতগুলি দূর করতে চেয়েছেন। তিনি তাঁর সংবাদপত্রের মধ্যে দয়াধর্ম, ভদ্রতা ও শান্তিপ্রিয়তার মতো গুণাবলী ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলস্বরূপ, এই মহামারীর সময় যখন সমগ্র বিশ্ব আক্রান্ত, অবদমিত; টাইমস অব ইন্ডিয়াতে আমরা দেখি 'Shot of Hope', 'Beacons of Hope'-এর মতো রচনা।

ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা শ্রীমতী ইন্দু জৈনের নির্দেশ ছিল তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ হওয়ার পরে শোক না করে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত হতে হবে। ❙

ক্লান্তি দূর করতে অদ্বিতীয় খেজুর

রিংকী ব্যানার্জি

পুষ্টিগুণে ভরপুর খেজুরে রয়েছে ভিটামিন, আঁশ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও জিঙ্ক। খেজুর একজন সুস্থ লোকের শরীরের আয়রনের চাহিদার প্রায় ১১ ভাগই পূরণ করে। তাই প্রতিদিন খেতে পারেন খেজুর।

পুষ্টিবিদদের মতে, শরীরের দরকারি আয়রনের অনেকটাই খেজুর থেকে আসে। এছাড়া ডায়াবেটিস থাকলে প্রচলিত খেজুরের বদলে শুকনো খেজুরকে ডায়েটে রাখতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। পৃথিবীতে সাড়ে ৪০০ জাতের বেশি খেজুর পাওয়া যায়।

রমযান মাসে ইসলামি সম্প্রদায়ের লোকেরা রোজা বা উপবাস শেষে নিয়মিত খেজুর খান। সারাদিন রোজা থাকার জন্য শরীরে যে ঘাটতি হয় তা খেজুর দূর করে। কেননা খেজুর খুব সহজে হজম হয়ে শরীরে শক্তি সরবরাহ করে।

খেজুরের উপকারিতা

১। খেজুরে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ, ক্যালসিয়াম ও পটাশিয়াম। খেজুরে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

২। খেজুর শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়ায়। খেজুরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উপাদান যা শারীরিক ও মানসিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

৩। ফাইবার সমৃদ্ধ ফল খেজুর। তাই এই ফল ডায়েটে রাখতে পারলে কোষ্ঠকাঠিন্য সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না।

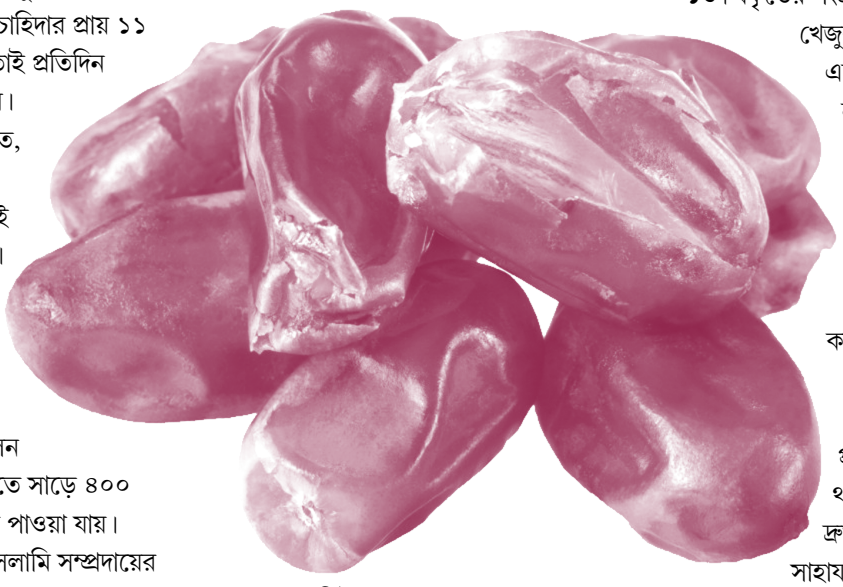

৪। প্রতিটা খেজুরে রয়েছে ২০ থেকে ২৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেসিয়াম। উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

৫। রক্তাল্পতায় ভোগ্য রোগীরা প্রতিদিন খেজুর খেতে পারেন। একজন সুস্থ মানুষের শরীরে যতটুকু আয়রন দরকার, তার প্রায় ১১ ভাগ পূরণ করে খেজুর।

৬। যারা চিনি খান না তারা খেজুর খেতে পারেন, চিনির বিকল্প খেজুরের রস।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে জলে খেজুর ভিজিয়ে রেখে খেতে পারেন।

৮। খেজুরে থাকা নানা খনিজ হার্টের জন্য উপকারী।

৯। খেজুরে লিউটেন ও জিক্সাথিন চোখের রেটিনা ভালো রাখে।

১০। খেজুরে থাকা ক্যালসিয়াম হাড় গড়তে সাহায্য করে।

১১। খেজুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক আঁশে ভরা। এক গবেষণায় দেখা গেছে, খেজুর পেটের ক্যানসার প্রতিরোধ করে। যারা নিয়মিত খেজুর খান তাঁদের ক্যানসারের ঝুঁকি কম।

১২। মাত্র কয়েকটা খেজুর খিদের জ্বালা কমিয়ে দেয়। পাকস্থলীকে কম খাবারের উপযোগী করে। ফলে শরীরে ওজন কমাতে সাহায্য করে।

১৩। যকৃতের সংক্রমণের ক্ষেত্রে খেজুর উপকারী। এছাড়া গলা ব্যথা, নানা ধরনের জ্বর ও সর্দি-কাশিতে খেজুর উপকারী। খেজুর অ্যালকোহলজনিত বিষক্রিয়ায় চটপট কাজ করে।

১৪। খেজুরে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক চিনি থাকার জন্য খেজুর দ্রুত শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। সারাদিন উপবাসের পর যদি মাত্র ২টো খেজুর খান তবে চটপট ক্লান্তি কেটে যাবে।

১৫। খেজুরে নানা ভিটামিন থাকায় মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার গতি বাড়াতে সাহায্য করে। নার্ভের ক্ষমতা বাড়ায়। একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিয়মিত খেজুর খায় তাদের দক্ষতা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি।

১৬। খেজুর খেলে পিপাসা দূর হয়।

১৭। খেজুরে অ্যাস্ট্রাডিওল ও ফ্ল্যাবহনয়েডের মাত্রা অনেক বেশি থাকে বলে শুক্রাণুর সংখ্যা বাড়ায়।

নদীয়ায় এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে দুষ্কৃতি আক্রমণ।

রাজনীতির আড়ালে জেহাদি শক্তির উত্থান

ড. নীতীশ দাশ

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার প্রকৃতি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যে, রাজনৈতিক মদতে বিভেদকামী শক্তির অভ্যুদয় মানবিক সমাজের পক্ষে কতটা ভয়ংকর হতে পারে। কয়েকদশক ধরে সার্বিক সংস্কৃতির অবক্ষয় এবং শিক্ষার অবনমন ঘটিয়ে বাঙ্গালির সোনালি সংস্কৃতির অবশিষ্টাংশটুকুও শেষ করে দেওয়া হয়েছে, রয়ে গিয়েছে কিছু স্মৃতিচিহ্ন। বাঙ্গালি তার উদারতা ও মানবিকতার গরিমা হারিয়ে দেশে বিদেশে এখন করুণার পাত্র। যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া অসহায় মানুষের আর্তনাদ ও নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার বিভীষিকাময় দৃশ্য। যা কোনো সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, তা দেখে শিউরে উঠেছে সারা বিশ্ব। রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি নৃশংস নির্যাতনের বিরুদ্ধে কম-বেশি তিরিশটা দেশে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে প্রবাসী বাঙ্গালিরা। এই অবস্থার প্রতিকার চেয়ে দেশের কয়েকশো বিশিষ্টজন রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন। কয়েক হাজার আইনজীবী আক্রান্ত মানুষদের জন্য সুবিচার চেয়ে সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ভেসে উঠেছে জনজাতির উপর নেমে আসা নারকীয় নির্যাতনের ছবি। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এই ঘটনা শুধু শাসক বিরোধী রাজনীতি করার মাশুল নয়, সেইসঙ্গে অভিসন্ধিমূলকও। কারণ দলমত নির্বিশেষে আক্রমণের লক্ষ্য মূলত হিন্দু সমাজের মানুষ, বিশেষত, গরিব ও অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা নিষ্পেষণের শিকার হয়েছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই প্রতিহিংসাপরায়ণতা যতটা না রাজনৈতিক তার চেয়ে অনেক বেশি আন্তঃ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা বলে মনে হতে পারে। এমনও হতে পারে যে মৌলবাদী জেহাদি শক্তি বাঙ্গলার মাটিতে নাশকতামূলক ষড়যন্ত্রের যে জাল বুনে রেখেছে, এটা তারই অংশবিশেষ। একটু ফিরে তাকালেই বোঝা যায়, এখানে এ ধরনের ঘটনার একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। দেগঙ্গা, ধুলাগড়, মালদা, তেলেনিপাড়া, মুর্শিদাবাদ-সহ একাধিক জায়গায় বিগতদিনে জেহাদিশক্তির নারকীয় তাণ্ডব আজও আমাদের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে রয়েছে।

স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতিদের আক্রমণে রক্তাক্ত জয়দেব বিশ্বাস

একুশের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সমাজবিরোধী মৌলবাদী ও জেহাদিরা যৌথভাবে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর যে দানবিক অত্যাচার শুরু হয়েছিল তা প্রায় দু' সপ্তাহ ধরে অপ্রতিহতভাবে সংঘটিত হয়ে গেল। রাজনৈতিক এবং এক বিশেষ সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তদের তাণ্ডবে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘরছাড়া, হাজার হাজার মানুষ পড়শি রাজ্যের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, কয়েকশো মানুষের দোকান ও ঘরবাড়ি হয় পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে না হয় ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গরিব মানুষের জমির ফসল তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কোথাও আবার পুকুরে বিষ ঢেলে মাছ মেরে দেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগীদের সিংহভাগই প্রান্তিক তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষণীয়ভাবে এমন চরম দুঃসময়ে মানবতার ফেরিওয়ালা বিশিষ্টজনেরা এই জাতীয় অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে কখনও আওয়াজ তোলা তো দূরের ব্যাপার, এই ভয়াবহ নির্মমতাকে গোপন করার চেষ্টা করে চলেছেন। আতান্তরে পড়ে অসহায় মানুষের জীবন-জীবিকা যখন ঝুঁকির মধ্যে দাঁড়িয়ে তখন এমন নিষ্ঠুর অমানবিক দ্বিচারিতা কীসের পরিচয় বহন করে? মানবসমাজের সংকটকালে এমন অমানবিক আচরণ কি বাঙ্গালি জাতির শোভা পায়? বাঙ্গালি নবজাগরণের কাণ্ডারি--- সংস্কৃতিবান, প্রগতিশীল বাঙ্গালি সে কথা কি ভুলে যাবে? গাজায়, উত্তরপ্রদেশ বা গুজরাটে পান থেকে চুন খসলেই যারা কলকাতার রাস্তায় মোমবাতি আর সাংবাদিক সমেত বেরিয়ে পড়ে তাদেরও কোথাও দেখা গেল না। মনে রাখা দরকার, নগরে আগুন লাগলে দেবালয় যেমন রক্ষা পায় না, তেমনি সমাজে ধ্বংসলীলা শুরু হলে কেউই কিন্তু মৌলবাদী জেহাদি শক্তির সামনে নিরাপদ নয়। কারণ এই অপশক্তির একমাত্র উদ্দেশ্য রাজনীতির ছাতার নীচে আশ্রয় নিয়ে বিদ্বেষমূলক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড সংঘটিত করা। তাই বিধর্মী হলেই শিয়রে শমন। এমন ভাবনার যথেষ্ট কারণ মজুত রয়েছে এই বাঙ্গলায়। এখানে রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদীরা জেহাদি মতাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মাদক চোরাচালান, লাভ জেহাদ বা বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা-সহ যাবতীয় দেশবিরোধী অসামাজিক কার্যকলাপে উৎসাহিত হয়। বৃহত্তর মানবিক সমাজকে বিষময় করে তোলে। তাই হয়তো অনেকে বলেন পশ্চিমবঙ্গ এখন সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া। এই দলের সদস্যরা বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

পুরুলিয়ার বলরামপুরে দুই বিজেপি কর্মীকে মেরে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাশকতামূলক কাজে সরাসরি যুক্ত রয়েছে এমন ঘটনাও খবরে প্রকাশিত হয়েছে।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড, নিউটাউনে ভিন রাজ্যের আন্তর্জাতিক অপরাধীদের উপস্থিতি বা মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার হওয়া ৬ জন লস্কর-ই-তৈবার সদস্য আমাদের শঙ্কিত করে এই ভেবে যে তবে কি পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশবিরোধী শক্তি, অসামাজিক ও জেহাদিদের মরুদ্যান হয়ে উঠেছে? এরই ধারাবাহিকতায় মে মাসের ২ তারিখের পর মানুষ যে প্রতিহিংসার বিভীষিকাময় তাণ্ডব দেখল স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সারা রাজ্যজুড়ে এমন বিস্তৃত জেহাদি কার্যকলাপ আগে কখনো ঘটেছে বলে জানা যায় না। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই বিভিন্ন জেলায় শুরু হয়েছিল প্রতিহিংসামূলক উৎপীড়ন ও জুলুমবাজি। প্রতিপক্ষের দোকানঘর ও বাড়ি তছনছ করে পুড়িয়ে দেওয়া হলো। ছিনিয়ে নিয়ে গেল তিল তিল করে সঞ্চিত ধনসম্পদ। খুন, সন্ত্রাস ও রাহাজানির উগ্রতায় গ্রাম মফস্সলের পরিচিত পরিবেশ অশান্তির বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে আক্রান্ত হয়েছে মূলত বিজেপির নেতা-কর্মীরা। অবশ্য সংযুক্ত মোর্চার কর্মী এবং অবিজেপি হিন্দুদের উপরও আক্রমণের খাঁড়া নেমে এসেছে। এসব দেখে সচেতন রাজ্যবাসীর মনে হতে পারে, যা ঘটছে তা অনুব্রত মণ্ডলের হুমকির যথাযথ বাস্তবায়ন। উনি ভোট প্রচারের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমে বলেছিলেন--- 'ভয়ংকর খেলা হবে, এই মাটিতেই খেলা হবে।' সত্যিই এ এক ভয়ংকর খেলা শুরু হয়েছে, যা দেখলে ভয়ে শিউরে উঠতে হয়। শীতলকুচি থেকে সুন্দরবন, বারুইপুর থেকে বীরভূম, রাজ্যের সর্বত্র প্রতিশোধের লেলিহান শিখা জ্বলছে। মদমত্ত দুর্বৃত্তদের হিংস্রতা থেকে রেহাই পায়নি প্রান্তিক গরিব শ্রেণীর বিশেষত বনবাসী সম্প্রদায়ের মা-বোনেরাও। লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে যখন শুনি বনবাসী মহিলাদের নগ্ন করে মারধর করা হয়েছে। তাদের ধর্ষণ করে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিপক্ষের যারা এলাকায় থাকতে চেয়েছে তাদের থেকে ১০০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হচ্ছে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকে আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়েছে ১৫১ জন। জীবন বাঁচাতে এ রাজ্য থেকে পড়শি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে প্রায় ৯০০০ মানুষ। ৩৩৭২টি গ্রামে প্রায় ৩৮০০০ হিন্দু পরিবার পৈশাচিক নিপীড়নের কশাঘাতে জর্জরিত হয়েছে। বিজেপি করার 'অপরাধে' কাঁকুড়গাছিতে এক কর্মীকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মৃত কর্মীর নাম অভিজিৎ সরকার। পরিবারের দাবি, পুলিশের চোখের সামনেই হামলায় পিটিয়ে মারা হয় অভিজিৎকে।

সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত প্রতাপনগর অঞ্চলের রাজনৈতিক হিংসার বলি হারান অধিকারী নামে এক বিজেপি কর্মী। কেবল ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে বা শারীরিক নিপীড়ন করেই থেমে থাকেনি দুষ্কৃতীরা। আট থেকে আশি বছরের মা-বোনেরা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলো শূন্য চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সরস্বতী জানাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সরেজমিনে সমীক্ষা করতে যাওয়া বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের কথায় ঘরছাড়া মানুষগুলোর চোখে মুখে নির্যাতনের ভয়াবহতা এখনো স্পষ্ট। বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে, দুঃসহ দুর্ভোগ সয়ে, বুকভরা হাহাকার নিয়ে আক্রান্ত মানুষগুলোর অবস্থা ঠিক যেন নিজভূমে পরবাসী। ওদের চোখেমুখে বেঁচে থাকার ব্যাকুলতা স্পষ্ট। তাই ত্রাণ শিবিরের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধ হিন্দু মহিলা নন্দীগ্রামের অস্থায়ী ক্যাম্প সফরকালীন রাজ্যপাল মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করে ওঠেন যে তিনি যদি ধর্ম পরিবর্তন করেন তবে তিনি বেঁচে থাকতে পারবেন কিনা। এক কথায় জেহাদি কার্যকলাপ প্রশাসনের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। প্রশাসন নির্বিকার,

নিরুত্তাপ। এফআইআর পর্যন্ত নিচ্ছে না পুলিশ। ভুক্তভোগী মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে না। শাস্তি হয়নি মানুষরূপী দুর্বৃত্তদের। অবশেষে বিপন্ন মানুষজন সুবিচারের আশায় নাগরিক অধিকারের দাবিতে সর্বোচ্চ আদালতের দরজায় কড়া নাড়ছে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যে কম-বেশি ৩৩ জন প্রতিহিংসার আগুনে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। কী ছিল তাদের অপরাধ? নিজেদের জীবন অকালে বিসর্জন দিয়ে ওই মানুষগুলো রাজ্যবাসীকে কি কিছু বার্তা দিয়ে গেল?

Wife of BJP activist gang-raped in Khardah

Sanjib Chakraborty

Khardah: A 40-year-old homemaker, wife of a BJP worker, was allegedly abducted and gang-raped by four masked youths at Khardah's Patulia off the Kalyani Expressway on Wednesday evening.

Her husband, a priest in the local temple and also BJP's member as 'shakti pramukh', alleged in the FIR that while she was being abused sexually and verbally, his wife's tormentors repeatedly threatened her to kill her husband for his political leanings. No one has been arrested in this connection yet.

According to the complaint with Khardah PS, the incident took place around 8pm while the woman, a Patulia resident, was on her way back home after dropping her 12-year-old son, a Class-VII student, at his private coaching class. "While she was passing by a local temple, two unidentified youths covering their faces with towels attacked her from behind. One of them covered her mouth with his hand and another dragged her away to an under-construction building nearby. Two more persons joined them at the spot and abused her sexually. My wife was brutally raped by all the four, who had their faces covered. They also threatened her with harm if I dared to continue with my political propensity as a BJP leader," the woman's husband claimed in the FIR.

Amar Kar

The woman being taken to hospital

Trinamool's legislative party chief whip and Panihati MLA, Nirmal Ghosh, said, "I have already asked police to investigate the 'allegation of gang-rape' and take stern action against the accused if anybody is found guilty. But BJP is hatching conspiracy against Trinamool." A BJP state-level team is visiting the spot on Friday. Ananda Roy, DCP, Zone II, Barrackpore commissionerate, said, "We have received a complaint and a probe is on."

চলমান রাজনৈতিক সহিংসতার গলি বেয়ে বিভেদকামী জেহাদি শক্তি প্রকাশিত হলে জনমানসে সিঁদুরে মেঘ উঁকি দেয় বইকী! প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী জেহাদিদের সিংহভাগই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা মুসলমান। তাই সাধারণ মানুষের ওপর একচেটিয়া আক্রমণ যে জেহাদি গোষ্ঠীর সদস্যদের বর্বরতার নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ সে নিয়ে সংশয় থাকার জায়গা নেই। রাজনৈতিক নেতারা সারদা ও রোজভ্যালি কেলেঙ্কারির টাকার একটি বড়ো অংশ বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামির বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে খাটানোর পাশাপাশি সীমান্ত চোরাকারবারেও বিনিয়োগ করেছেন। বাংলাদেশ ও ভারতের গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, এই বিনিয়োগকৃত টাকার লভ্যাংশ জঙ্গিদের কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, ধর্মীয় উগ্রবাদ সকল ধর্মের জন্যই বিপজ্জনক। অপরাজনীতির কারণেই আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মতো সমাজে জঙ্গিবাদের শিকড় খুব গভীরে। উদাহরণস্বরূপ, এই দুটি দেশেই জঙ্গি গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থকরা জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে বড়ো ভূমিকা নেয়। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্যই কিছু কিছু রাজনৈতিক দল আদর্শগত এবং সামাজিকভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের বিকাশ বা জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থানের আশঙ্কার পেছনে ধর্মীয় উগ্রতার পাশাপাশি মূলধারার নীতিহীন রাজনৈতিক দলগুলির সুবিধাবাদই বেশি দায়ী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, মুম্বই হামলার মূলচক্রী হাফিজ সইদের জেহাদি সংগঠনটি 'মিল্লি মুসলিম লিগ' নাম নিয়ে পাক রাজনীতির মূলস্রোতে প্রবেশ করেছে। আফগানিস্তানে তালিবান প্রভাবিত জোট সরকার গঠন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। কেরলে ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (আই-ইউ-এম-এল) সম্মিলিত গণতান্ত্রিক জোটের শরিক হিসেবে কংগ্রেসের সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়ায় রয়েছে। আই-ইউ-এম-এল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লিগ কেরলে বাম গণতান্ত্রিক জোটের শরিক। এভাবেই মৌলবাদী দলগুলি রাজনীতির বাতাসে ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমভাবে পশ্চিমবঙ্গের মানুষও এবারের নির্বাচনে প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার চেহারা কেমন হতে পারে তা প্রত্যক্ষ করল। এতদিন অভিযোগ ছিল তৃণমূল একটি মুসলমান তোষণকারী দল। কিন্তু কেরলে তথাকথিত সেকুলার সিপিএমও মুসলিম লিগের সঙ্গে দু'বছর ১৯৬৭-৬৯, জোট করে ঘরে বাইরে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। পরে সিপিএম পার্টি কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয়, মুসলিম লিগের মতো কোনও সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে জোট করা যাবে না। অথচ এবারের নির্বাচনের সময়ে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সান্নিধ্য লাভের জন্য বামপন্থীদের অদম্য উৎসাহ অনেকেরই নজর কেড়েছে। এই বঙ্গে ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়েছে বামফ্রন্ট। অবশ্য সিপিএম নেতৃত্বের একটা অংশ আব্বাসের সঙ্গে এই অনৈতিক জোট মেনে নিতে পারেননি।

এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ঘটমান উগ্র মৌলবাদী জেহাদি কার্যকলাপ সুসংহত, ধারাবাহিক এবং পূর্বপরিকল্পিত কৌশলের একটি অংশ এবং এই ঘটনাগুলি রাজনৈতিক মদতে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চিহ্ন বহন করছে। দেশের অন্যত্র এহেন উদ্বেগজনক পরিস্থিতির নজির আজও বিরল। অস্বীকার করার উপায় নেই যে চারপাশে এখন অত্যাচার, উৎপীড়ন, পাশবিকতা ও সহিংসতার কালো থাবার আঘাতে মানুষের মনে ঘৃণা ও ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। যে রাজনীতি উন্নয়নের কথা বলে না, যে রাজনীতি যুবসমাজের ভবিষ্যতের কথা বলে না, যে রাজনীতি সামাজিক সমতা ও স্থিতাবস্থার বদলে সামাজিক বিভাজনকে উৎসাহিত করে সে রাজনীতি, আর যাই হোক, কখনো জনকল্যাণমুখী হতে পারে না। এই নির্মম বাস্তবতা থেকে চোখ ঘোরাতে শাসকশ্রেণী বিভিন্ন সময়ে নানান ছলনার অতীতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অজুহাতে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি তাতিয়ে তোলা হয়েছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে প্রশাসনের নাকের ডগায় অবাধে চালানো হয়েছিল সরকারি সম্পত্তি লুঠপাট ও অগ্নিসংযোগের মহোৎসব। অতএব প্রশ্ন উঠবে, যারা এর পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা, তারা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভে সচেতনভাবে বাঙ্গালির স্বাভিমানকে আঘাত করার চেষ্টা করেছেন। তারা হয়তো ভুলে গেছেন, মানবিক জীবনবোধ বাঙ্গালির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য যা বাঙ্গালির সংস্কৃতি চেতনাকে আঁকড়ে ধরে আজও বেঁচে রয়েছে। এহেন রাজনৈতিক অপসংস্কৃতির আগ্রাসনের ফলে বিলুপ্তির পথে বাঙ্গলার রাজনৈতিক কৌলিন্য, সাংস্কৃতিক গৌরব, সামাজিক ঐতিহ্য। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, পশ্চিমবঙ্গের এমন দশা কেন হলো? জীবনের জন্যে রাজনীতি নাকি রাজনীতির জন্যে জীবন, সেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। 'মানুষের জন্যে কাজ' করার প্রেরণায় যাঁদের প্রাণ কাঁদে, সেই মানুষই যদি না থাকে তাহলে তাঁরা কাঁদবেন কাদের জন্যে? যদি আত্মপরিচয়ের আত্মহননই ভবিতব্য হয় তাহলে স্বাভিমান, অস্মিতা এসবের দরকার কীসের জন্য? ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে বাঙ্গালি জাতি কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে? এখন সেটাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

(লেখক একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক)

আক্রমণে মৃত বিজেপি কর্মী।

রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও জেহাদি আক্রমণে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক হিন্দুরা

নীল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের মাত্র তিনটি রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার লম্বা ইতিহাস পাওয়া যায়। এগুলি হলো কেরল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ। এই তিনটি রাজ্যের মধ্যেই মিল একটি জায়গায়— এগুলিতে বামপন্থীরা একটি লম্বা সময় ধরে শাসন করেছিল বা এখনও শাসন করছে। কয়েক দশক আগে পর্যন্ত বিহারেও রাজনৈতিক হিংসা, ভোটের সময় হানাহানি দেখা যেত— বর্তমানে তা ইতিহাস। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে শেষ অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত রয়েছে। নির্বাচনের সময় হিংসা, বোমাবাজি, খুনোখুনি, সন্ত্রাস, মানুষকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেওয়া এসব বামপন্থী আমল থেকেই চলে আসছে। কিন্তু ২০১১-তে তথাকথিত 'পরিবর্তন'-এর পর মানুষ ভেবেছিল— এই রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাসে এবার হয়তো একটু ছেদ পড়বে। কিন্তু এই তৃণমূল সরকার যেন 'উন্নততর বামফ্রন্ট' সরকার হয়েই ফিরে এল। নির্বাচনের আগে যে কাজগুলো করতে সিপিএমের ক্যাডাররাও লজ্জা পেত— সেই কাজগুলোই অবলীলায় তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা করতে লাগল। আর রাজনৈতিক খুনোখুনি তো আছেই। শেষ কয়েক বছরেই রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির ১৫০-র বেশি নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। এবং বিরোধী কর্মীদের হত্যা করার একটি অভিনব কায়দাও বার করেছে বর্তমান শাসক দল। তা হলো গ্রামেগঞ্জে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দিয়ে তা আত্মহত্যা বলে চালানো। শুধু কর্মীদেরই নয়, এমনকী উত্তরবঙ্গের এক বিধায়ককেও এই একই পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়েছে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গোটা বিশ্বের কাছে সম্ভ্রমের বিষয়। অথচ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পিছনে সবচেয়ে বেশি বলিদান যাদের— সেই বাঙ্গালিদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেই বহু বছর ধরে গণতন্ত্র ভূলুণ্ঠিত। গণতান্ত্রিক দেশের অংশ হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষ নিজের পছন্দমতো রাজনৈতিক দল করতে পারবে, পছন্দমতো রাজনৈতিক দলকে ভোট দিতে পারবে— সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনাই পশ্চিমবঙ্গে কেউ ভাবতে পারেন না। এখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সবসময়েই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। আর সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এখানকার প্রশাসন ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ। সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা ও পুলিশ এই রাজ্যে শাসক দলের অঙ্গুলিহেলনে কাজ করে। ভোটে ছাপ্পা হওয়ার সময় কোনোরকম বাধা না দেওয়া, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভুলভাবে পরিচালিত করা, শাসক দলের কর্মীদের অপরাধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া, বিরোধী দলের কর্মীদের নানারকম মিথ্যা কেস দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে শাসকদলকে নানাভাবে সহায়তা করা পুলিশ-প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে পড়ে।

গত ২ মে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর দিন থেকে এই রাজ্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে— তা স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি। বিরোধী দলের কর্মীদের ঘর, দোকান ভাঙচুর, কয়েক হাজার বিজেপির পার্টি অফিস ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার-সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিজেপি কর্মীরা অসমে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। লক্ষাধিক কর্মী ঘরছাড়া। এখনও পর্যন্ত ৪২ জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছেন নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পর থেকে। এই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জেহাদি মানসিকতা। রাজ্যের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে হিন্দুদের জীবন দুর্বিষহ করে দেওয়া হয়েছে। বহু জায়গাতেই জেসিবি নিয়ে এসে হিন্দু গ্রামের মাটির বাড়িগুলি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ঘরছাড়া। কিন্তু সংবাদপত্র ও নিউজ চ্যানেলগুলো পাছে রাজ্য সরকার কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দেয়— তাই সারা রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অছিলায় যে জেহাদি

আক্রমণ চলছে তার কোনো খবরই প্রকাশ করছে না। তাই অগত্যা সোশ্যাল মিডিয়াই ভরসা। গোটা রাজ্যের অসংখ্য হিংসাত্মক ঘটনার হয়তো এক শতাংশও আমরা জানতে পারছি না। তবু যে ঘটনাগুলো বিভিন্ন ভিডিয়ো বা অডিও রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি তাও শিউরে ওঠার মতো। পূর্ব বর্ধমান জেলার কিছু জায়গায় হিন্দুদের ওপর জিজিয়া কর চাপানো হয়েছে— বলে শোনা যাচ্ছে। দুই চব্বিশ পরগনার কোথাও কোথাও বাড়ির মেয়েদের জেহাদিদের বাড়িতে কয়েক রাত রাখলে তবেই বাড়ির পুরুষরা বাড়ি ফিরতে পারবে বলে শর্ত দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য গণধর্ষণের ঘটনা রাজ্য জুড়ে ঘটেছে। ছেলের সামনে মাকে, ভাইয়ের সামনে বোনকে, বাবার সামনে মেয়েকে, স্বামীর সামনে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বহু জায়গায় জেহাদিরা হিন্দু গ্রাম আক্রমণ করে সমস্ত বাড়ির সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এমনকী বাড়ির গবাদি পশুও নিয়ে যাচ্ছে। জোর করে জমি, সম্পত্তি লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বহু জায়গায় বাড়ি ফেরার জন্য কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ টাকা অব্দি তুলে দিতে হচ্ছে তৃণমূলের গুন্ডাদের হাতে। নদিয়ার চাপড়া, কলকাতার তিলজলা-সহ বেশ জায়গায় হিন্দু মন্দিরও আক্রান্ত হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে কলকাতার তিলজলা ও হুগলীর চন্দননগরে কয়েকদিন ধরে চলা হিন্দুদের ওপর আক্রমণের কথা তো আমরা সকলেই জানি।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা মনে করিয়ে দেয় ২০০১-এ বিএনপি জেতার পর বাংলাদেশে হওয়া ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতনের কথা। বরিশাল-সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার হিন্দু মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়। ১২ বছরের বালিকা পূর্ণিমা শীলের মা ধর্ষণকারীদের অনুরোধ করেন, 'তোমরা এক এক করে যাও বাবারা। আমার মেয়েটা নাহলে মরে যাবে। ও ছোটো তো।' তারপর সারা রাত ধরে ১০-১২টা নরপিশাচ পূর্ণিমার ছোট্ট শরীরটা খুবলে খুবলে খেতে থাকে। প্রায় ৫ লক্ষাধিক হিন্দু বাংলাদেশ থেকে প্রাণভয়ে ভারতবর্ষে পালিয়ে এসেছিল। সেই একই পরিস্থিতি চলছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের এই অবস্থা দেখলে মনে পড়ে ১৯৮৯-৯০ সালে কাশ্মীরের অবস্থা। যখন সমস্ত কাশ্মীরে হিন্দুদের রাতারাতি কাশ্মীর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বহু কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাঁদের ঘরের মহিলাদের রাস্তায় ফেলে গণধর্ষণ করা হয়েছিল। আজ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও সেরকম। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে পশ্চিমবঙ্গ বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসেবে গড়ে উঠেছিল— সেখানে আজ হিন্দুরাই সংখ্যালঘু হওয়ার পথে। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রায় সমস্ত মহকুমাতেই হিন্দুরা সংখ্যালঘু। এর প্রধান কারণ বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক মুসলমান অনুপ্রবেশ এবং মুসলমানদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও অত্যধিক জন্মহার। ১৯৮০-র দশক থেকে প্রথম বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে বেআইনি মুসলমান অনুপ্রবেশ হতে শুরু করে। তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের প্রত্যক্ষ মদতেই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলির জনবিন্যাস ক্রমশ বদলানো শুরু হয়। রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড করিয়ে দিয়ে সিপিএমের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়। এরাই এখন তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক হিংসা, অবাধ ভোট না হওয়া এবং প্রশাসন ব্যবস্থার রাজনীতিকরণ যেন ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতিই একটি বড়োসড়ো চ্যালেঞ্জ। এই প্রবণতা অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে ক্রমশ পশ্চিম বাংলাদেশ হওয়ার পথে এগোচ্ছে। গ্রামের প্রান্তিক হিন্দুদের কাছে ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষা করা, পরিবারের মহিলাদের সম্ভ্রম বাঁচানোই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ হিন্দুদের আশা, যেভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেখানে ভারতবর্ষের স্বার্থ ও সেখানকার ভারতবর্ষের সংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদের স্বার্থ রক্ষা করেছে— সেইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও অবিলম্বে এই ধরনের কোনো সাহসী পদক্ষেপ কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করবে দেশের স্বার্থে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে।

ফঃ ৪

পশ্চিমবঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসা শুধু রাজনৈতিক নয়

পায়েল চট্টোপাধ্যায়

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হলো। আমরা দেখলাম যে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমান তোষণকারী একটি রাজনৈতিক দল আবারও পশ্চিমবঙ্গের মসনদে বসল। কিন্তু কেন বসতে পারলো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কিছু বিষয় আমাদের দেখতে হবে।

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন শুধু কয়েকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে নির্বাচন বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, এটি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে মুসলমান তোষণকারী রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে ভারতভূমি বহুখণ্ডিত দেখতে চাওয়া ভারতে বসবাসকারী ঘরশত্রু ও ইসলামিক জেহাদিদের মিলিত জোট এবং রাষ্ট্রবাদী শক্তির মধ্যে লড়াই। কেন এধরনের লড়াইয়ের কথা বললাম সেটা বুঝতে একটু ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।

১৯৪৬ সালে ১৪ আগস্ট ভারত বিরোধী চক্রান্তের রূপরেখাকে বাস্তবায়িত করতে অর্থাৎ ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করতে এই পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছিল এক চক্রান্ত। মুসলিম লিগ ও কমিউনিস্ট পার্টি একত্রিত হয়ে বলেছিল 'পাকিস্তান মানতে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে'— এবং সেটাই হয়েছিল। তার ফলে ১৯৪৬ সালে জেহাদি আক্রমণে হিন্দুর রক্তে মাটি লাল হয়ে গিয়েছিল।

পরবর্তীকালে স্বাধীনতার পর সমগ্র ভারতবর্ষের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও বোনা হয়েছে ভারত বিরোধী বিভিন্ন চক্রান্তের জাল।

কংগ্রেস সরকার বিগত ৭০ বছর কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, যার প্রতিবাদ করে প্রাণ দিতে হয়েছে বাঙ্গলার ভূমিপুত্র তথা ভারতমাতার বীর সন্তান ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। শ্যামাপ্রসাদ ভারত বিরোধী চক্রান্তের কথা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই ১৯৫১ সালে রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শে ভারতীয় জনসঙ্ঘ নামে একটি দলের প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানকালে যা ভারতীয় জনতা পার্টি নামে পরিচিত। এই জনতা পার্টি জন্মলগ্ন থেকেই রাষ্ট্রবাদী দল হিসেবে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করছে।

অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার মাঝে ভারতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করলেও বিগত ৭০ বছর ধরে বিভিন্ন ভারত বিরোধী শক্তির সঙ্গে সন্ধি করে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার এবং বিদেশি শক্তির হাতে অর্পণ করার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস দল।

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০১৪ সালে আসে সেই সুবর্ণ সুযোগ। ভারতমায়ের সুযোগ্য সন্তান তথা রাষ্ট্রবাদী নেতা নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী ভারতবর্ষকে নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত বিরোধী শক্তি যেমন কমিউনিস্ট চীনের আগ্রাসন নীতি যেমন বাধার সম্মুখীন হলো তেমন ইসলামিক জেহাদি সন্ত্রাসবাদী দেশ পাকিস্তানের ভারতের মাটিতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বাধা পেল। অপরদিকে ভারতবর্ষকে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের সামনে প্রতিষ্ঠিত করবার লক্ষ্যে একের পর এক জনকল্যাণমূলক সাহসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছে মোদীজীর নেতৃত্বাধীন সরকার।

স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং পরবর্তীকালে কংগ্রেসের উপজাত তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে শাসিত হচ্ছে। ফলে সারা ভারতবর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হলেও পশ্চিমবঙ্গে ভারত বিরোধী শক্তি তাদের কাজ বিনাবাধায় চালিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদী জেহাদি শক্তি পশ্চিমবঙ্গকে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত করেছে। তারা এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে ভারতে তাদের কার্যকলাপ চালিত করছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এমনকী চীন ও বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর রাজ্য অসম, ত্রিপুরাতেও রাষ্ট্রবাদী শক্তি শাসনক্ষমতা দখল করায় সন্ত্রাসবাদী জেহাদি শক্তি ভয় পেয়ে গেল এবং দেখল পশ্চিমবঙ্গ হলো বর্তমানে তাদের

আক্রমণে বিধ্বস্ত বিজেপি কর্মীর দোকান।

একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাই এই রাজ্যে কোনো ভাবেই রাষ্ট্রবাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। তাদের কাজটা আরও সহজ হলো ধর্মনিরপেক্ষতার নামে মুসলমান তোষণকারী তৃণমূল সরকার আর ভারত বিরোধী কমিউনিস্ট পার্টি ও জাতীয় কংগ্রেস থাকায়।

এই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী ও জেহাদিরা পশ্চিমবঙ্গকে তাদের নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য আশ্রয়স্থল হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে নতুন পথ অবলম্বন করছে তা হলো লাভ জেহাদ ও ল্যান্ড জেহাদ। এতে একটা উদ্দেশ্য হয়তো সফল হতে পারে তাদের। তারা মনে করে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আস্তে আস্তে হিন্দুদের তাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গকে মুসলমান অধ্যুষিত রাজ্য বানাতে পারলে ভারতবর্ষকে আবারো খণ্ডিত করা সহজ হবে।

আক্রমণে বিধ্বস্ত বিজেপি কর্মীর বাড়িঘর।

এই ধরনের কথা কেন মনের মধ্যে এল তার ব্যাখ্যাও রয়েছে। আমরা দেখলাম ২০১৯ সালে আগস্ট মাসে যখন নাগরিকত্ব বিল ভারতের সংসদে পাশ হয়ে আইনে পরিণত হলো তখন সমগ্র ভারতবর্ষে যত না বিরোধিতা হলো তার থেকে বেশি বিরোধিতা হলো আমাদের পশ্চিমবঙ্গে। আসলে দেশ বিরোধী শক্তি ও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী দল পশ্চিমবঙ্গেও রাষ্ট্রবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেশদ্রোহী দলকে পাশে পেল। ফলে তাদের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলনের নাম করে আবারও সন্ত্রাসের মহড়া চালালো। পরবর্তীকালে এই পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা মুর্শিদাবাদ, মালদা থেকে আলকায়দার মতো বিদেশি জঙ্গিসংগঠনের সক্রিয় সদস্যের খোঁজও পাওয়া গেছে, গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা এইসব এলাকায় চালাচ্ছে লাভ জেহাদ ও ল্যান্ড জেহাদ। মুর্শিদাবাদে একটু খোঁজ নিলে জানা যাবে কীভাবে হিন্দু মেয়েদের লাভ জেহাদে ফাঁসানো হচ্ছে। ডোমকল, ইসলামপুর, সাগরপাড়া, শেখপাড়া-সহ বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে হিন্দুদের জমি দখল করে তাদের বাধ্য করা হচ্ছে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে। ধুলাগড়, সন্দেশখালির মতো বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজের ওপর প্রতি নিয়ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গে এত বাড়াবাড়ি শুরু করলো কেন এই জেহাদি ও দেশদ্রোহী জোট? সারা বিশ্বে এই সন্ত্রাসবাদী বা জেহাদিদের উদ্দেশ্য একটাই— গোটা বিশ্বে একমাত্র ইসলামকেই প্রতিষ্ঠিত করা। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইসলামিক দেশ হয়ে উঠলেও ভারতবর্ষে তাদের স্বপ্ন সফল হচ্ছে না। তারা তাই চায় গজওয়া ইয়াতুল হিন্দ অর্থাৎ ভারতবর্ষকে ইসলামিক দেশে পরিণত করতে। এই কাজে তারা ৭০ বছর ধরে ধীরে ধীরে এগোনোর চেষ্টা করলেও বর্তমানে চরম বাধার মুখে পড়েছে। কারণ দেশে রাষ্ট্রবাদী একটি শক্তিশালী সরকার হয়েছে। জেহাদিশক্তি চেয়েছিল পশ্চিমদিকে ইসলামিক দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে আর পূর্বদিকে বাংলাদেশের মাধ্যমে জেহাদি কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে ভারতে ওপর চাপ সৃষ্টি করতে। সেজন্য কাশ্মীরে ২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত হওয়ার ফলে কাশ্মীরে তাদের কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। এখন পড়ে রয়েছে শুধু পূর্বদিক অর্থাৎ বাংলাদেশ।

তাই এতদিন পশ্চিমবঙ্গকে সন্ত্রাসবাদীরা নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে এবং যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহার করলেও এখন পশ্চিমবঙ্গে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারই প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন স্থানে হিন্দুদেরও বিতাড়িত করবার চেষ্টা। এটা করতে পারলে পশ্চিমবঙ্গে একটা সময় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তখন তারা পশ্চিমবঙ্গকে তাদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করতে পারবে পরবর্তীতে কাশ্মীরের মতো পশ্চিমবঙ্গকেও ভারত থেকে আলাদা করবার চেষ্টা করার মধ্য দিয়ে ভারতভূমিকে আবার খণ্ডিত করতে পারবে।

এই উদ্দেশ্যগুলি তাদের যাতে সফল হয়, তার জন্য যাতে ভারতীয় জনতা পার্টির মতো রাষ্ট্রবাদী শক্তি পশ্চিমবঙ্গে শাসন ক্ষমতায় না আসে তার চেষ্টায় মরিয়া হলো।

ফলস্বরূপ তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলো পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে। তারা রাষ্ট্রবাদী দলের বিরুদ্ধে থাকা ভারত বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোটে প্রভাব খাটালো। তাদের নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কৌশলের মধ্যে একটি কৌশল হলো 'বিজেপিকে ভোট নয়'—। এই ক্যাম্পেন এই সন্ত্রাসবাদীরা হাত মিলিয়েছিল বামপন্থীদের সঙ্গে। বামপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল এই স্লোগানের মাধ্যমে দেশদ্রোহী শক্তির পক্ষে পরোক্ষে ভোট করানো। তারা সফলও হলো।

এই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী ও ভারত বিরোধী বৈদেশিক শক্তি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার ফলস্বরূপ ২ মে পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রতিনিয়ত হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। শুধু আক্রমণই নয়, হিন্দু মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার হচ্ছে। নবগ্রাম, ফারাক্কা, খেজুরি, নন্দীগ্রামের ধর্ষণ তার প্রমাণ। প্রতিনিয়ত হিন্দুদের আক্রমণ করে তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করা হচ্ছে।

কেন বার বার বলছি যে ভোট পরবর্তী হিংসা শুধু রাজনৈতিক নয়, এটা আসলে ইসলামিক জেহাদি গোষ্ঠীর হিন্দু বিতাড়নের প্রচেষ্টা। কারণ ২ মে পর আজ পর্যন্ত সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল এমনকী শাসক দলেরও হিন্দুদের ওপর আক্রমণ হচ্ছে, তাদের বিতাড়িত করার চেষ্টা চলছে। তার উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে প্রায় ৪৬ হাজারের ওপর মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে কেন অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছে। উত্তরবঙ্গের হিন্দুরা অসমে, দক্ষিণবঙ্গের হিন্দুরা ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ এমনকী দিল্লিতেও এই মুহূর্তে আশ্রয় নিয়েছেন।

ভারতের সমস্তরাজ্যেই নির্বাচন হয় কিন্তু কোথাও এই ভাবে হিন্দুদের ভিটেমাটি ছাড়া হতে দেখা যায়নি। তাই বলতে পারি যে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে একটি রাজনৈতিক দলকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে ইসলামি জেহাদি সন্ত্রাসবাদী শক্তি ও ভারত বিরোধী বিদেশি শক্তি তাদের উদ্দেশ্য সফল করার দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্থাৎ গজওয়া ইয়াতুল হিন্দ-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামিকরণে ভারতবর্ষকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হয়ে চলেছে, তাদের এখন নিশানা পশ্চিমবঙ্গ।

(লেখক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং প্রাবন্ধিক)

আড্ডার সরাসরি ক্লাস শুরু

নিউ ইয়র্কের ব্রনকসে মামুন টিউটোরিয়ালে ঘরোয়া পরিবেশে আয়োজন করা হয়েছিল অনুপ দাশ ড্যান্স অ্যাকাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দীর্ঘ প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ভার্চুয়াল ক্লাস চালিয়ে যাওয়ার পর সরাসরি ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছে অনুপ দাশ ড্যান্স অ্যাকাডেমি। এই প্রতিষ্ঠানটিকে ঘিরে শ্রদ্ধেয় নৃত্যগুরু অনুপ কুমার দাশের অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু তিনি তার স্বপ্ন পূরণের আগেই চলে গেলেন না-ফেরার দেশে। গুরু অনুপ কুমার দাশ নিজেই ভার্চুয়াল ক্লাস শুরু করে গিয়েছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ও ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিষ্ঠানটিকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির নাচের ক্লাসের জন্য রয়েছেন দু'জন গুণী নৃত্যগুরু। একজন হলেন অত্যন্ত গুণী নৃত্যগুরু আভা ভাট নাগা রায় এবং অন্যজন হলেন মিথান দেব। আড্ডা তথা অনুপ দাশ ড্যান্স অ্যাকাডেমির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিটির গুণী ব্যক্তিবর্গ।

প্রথমেই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট আল্পনা গুহ প্রয়াত গুরু অনুপ কুমার দাশকে স্মরণ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে উৎসাহমূলক কিছু কথা বলেন। এরপর গুণী শিল্পী ভারতী রায়ের 'আগুনের পরশমণি' গানটির সঙ্গে আমন্ত্রিত অতিথি ডাঃ প্রভাত দাস ও ডাঃ নাইমা খান মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান সূচনা করেন।

সবশেষে ছিল সংস্কৃতি পর্ব। এতে সংগীত পরিবেশন করেন— ভারতী রায়, আহম্মেদ টিটু, কিশলয়, অর্পিতা, পারমিতা, নির্জা সরকার। তবলায় ছিলেন হাছান আরিফ, গিটারে আহম্মেদ টিটু। কবিতা আবৃত্তি করেন নিউ ইয়র্কের অত্যন্ত গুণী কবি ছন্দা সুলতান এবং আড্ডার ছাত্রী রিয়া। নাচে ছিল কৃষ্ণা, ঈষা, চৈতন্য। সঞ্চালনায় ছিল সুরাইয়া আলম। সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় সিনিয়ার ছাত্রী মিথান দেব, নিরমা গোলদার, ঈশানী চৌধুরী, মৃদুলা আলম।

গো সেবা সংবাদ

যশ ঘূর্ণিঝড়ের কারণে দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। নদী ও সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে মানুষের ঘরবাড়ি, গবাদিপশু, পোশাক, খাদ্যসামগ্রী সবকিছু বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, মঠ মন্দির, সেবা ভারতী বিপুল পরিমাণে ত্রাণ নিয়ে দুর্গত মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। কিন্তু গোমাতা ও বলদের প্রতি দুর্লক্ষ্য হয়েছে। যেটা কিনা সব থেকে আগে দেখা দরকার ছিল। এই সুযোগে মানুষের অসহায়তায় সুযোগ নিয়ে কসাইয়ের দল কম পয়সার বিনিময়ে গোমাতা কিনতে ব্যস্ত। গোসাবা পরিবারের মাথায় এর প্রতিকারের ভাবনা আসে এবং ভাবামাত্র কাজ শুরু করে। গো সেবা পরিবারের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা মুহূর্ত অপেক্ষা না করে গোমাতা রক্ষার কাজে নেমে পড়ে। তাম্রলিপ্ত, কাঁথি, সাগর, বারাইপুর, সুন্দরবন জেলাতে ১৪৩ গ্রামে ৫ হাজার ৩ শো ২০টি গোমাতা ও বলদের খাবারের ব্যবস্থা করেন। এবং এখনোও তার প্রয়াস চলছে। আগামী কয়েক মাস এই সহযোগিতা গোসেবা পরিবার করতে থাকবে। স্থায়ী ব্যবস্থা করার জন্য নেপিয়ার ঘাসের বীজ কৃষকদের প্রদান করা হচ্ছে।

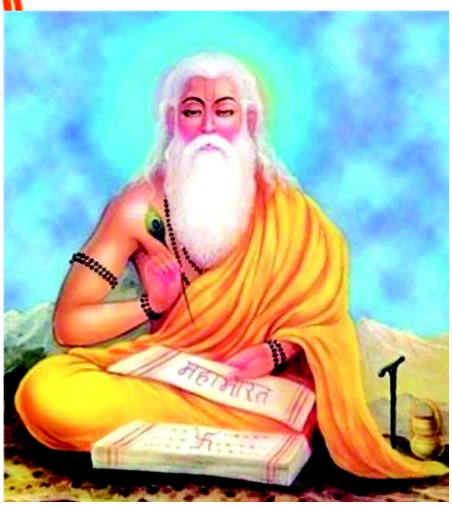

ভারতভূমির এক পবিত্র তিথি
শ্রীগুরু পূর্ণিমা

প্রবীর মিত্র

পর্ব, উৎসব ও সংস্কারের ভারতভূমিতে গুরুর মহত্ত্ব অপরিসীম। ভারতভূমির প্রত্যেক কণায় কণায় চৈতন্য স্পন্দন বিদ্যমান। পর্ব, উৎসব ও সংস্কারের জীবন্ত পরম্পরা একে আরও প্রাণবন্ত করেছে। তত্ত্বদর্শী ঋষিদের জাগ্রত এই ভূমির একটি পবিত্র উৎসব গুরুপূর্ণিমা। ভারতের সনাতন সংস্কৃতিতে গুরু শব্দটিকে ভাব হিসেবে দেখা হয় যা কখনো নষ্ট হয় না। সেইজন্য গুরুকে ব্যক্তি হিসেবে নয়, আদর্শ হিসেবে দেখা হয়েছে। এই দিব্য ভাবই আমাদের রাষ্ট্রকে জগদ্‌গুরু হিসেবে পরিচিত করেছে। গুরুপ্রণামের, গুরুপূজনের পবিত্র তিথি হলো আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা। পূর্ণিমা অর্থাৎ গুরু স্বয়ং পূর্ণ হয়ে শিষ্যকে পূর্ণতার বোধ করান। আমাদের সংস্কারিত করে, গুণের সংবর্ধন করে এবং দুশ্চিন্তা দূর করে গুরু আমাদের সঠিক পথে নিয়ে যান। গুরু শব্দের মাহাত্ম্য এর অক্ষরের মধ্যেই আছে। দেববাণী সংস্কৃতে 'গু' শব্দের অর্থ অন্ধকার বা অজ্ঞান এবং 'রু' শব্দের অর্থ দূরকারী অর্থাৎ যিনি অজ্ঞান ও অন্ধকার দূর করেন তিনিই গুরু। মাতা পিতা আমাদের জীবনে প্রথম গুরু। প্রাচীনকালে শিক্ষা প্রাপ্তির জন্য গুরুকুলের ব্যবস্থা ছিল যা এখন স্কুল কলেজ স্থান নিয়েছে।

চাণক্যের মতো গুরু চন্দ্রগুপ্তকে চক্রবর্তী সম্রাট তৈরি করেছিলেন। সমর্থ গুরু রামদাস মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে থেকে দেশকে রক্ষা করতে ছত্রপতি শিবাজীর মধ্যে সামর্থ্য তৈরি করেছেন। কিন্তু হাজার বছরের পুরনো এই গৌরবশালী পরম্পরাতে অসংগতি দেখা দেয়। এই অসংগতি লক্ষ্য করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার ভগবাধ্বজকে সংগঠনের গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পেছনে মূল ভাব ছিল ব্যক্তির পতন হতে পারে কিন্তু আদর্শ ও পবিত্র প্রতীকের নয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো স্বয়ংসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গুরুরূপে ভগবাধ্বজকে পূজা ও প্রণাম করে। গুরুপূর্ণিমার দিন সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা গুরুদক্ষিণা রূপে ভগবাধ্বজের সমক্ষে রাষ্ট্রের প্রতি নিজের সমর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ভগবাধ্বজকে গুরুরূপে মান্যতা দেওয়ার কারণ এই ধ্বজ তপোময় ও জ্ঞাননিষ্ঠ ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাধিক সশক্ত ও পুরাতন প্রতীক। উদীয়মান সূর্যের রঙের গৈরিকধ্বজ ভারতীয় সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক শক্তি, পরাক্রমী পরম্পরা এবং বিজয় ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক। সঙ্ঘ এই পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকে গুরুরূপে স্বীকার করেছে যা হাজার বছর ধরে রাষ্ট্র ও ধর্মের ধ্বজ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

গুরু কে?

যিনি অজ্ঞান রূপী অন্ধকার দূর করে জ্ঞান দ্বারা বিবেক জাগ্রত করেন। যিনি আমাদের প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। যিনি আমাদের উদ্দেশ্য আদর্শের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। যিনি আমাদের কার্যের সাকার রূপ। পরম পবিত্র ভগবাধ্বজ আমাদের গুরু। আমরা ব্যক্তি নয়, পরম পবিত্র ভগবাধ্বজকে গুরুরূপে স্বীকার করেছি। কারণ আমাদের ঋষি মুনিরা গুরুর গুণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কোনো এক ব্যক্তির মধ্যে সমস্ত গুণ পাওয়া কঠিন। ব্যক্তি স্খলনশীল (গায়ত্রীমন্ত্র নির্মিতা বিশ্বামিত্রের উদাহরণ)। ব্যক্তি সব জায়গায় উপস্থিত হতে পারেন না। ব্যক্তি মরণশীল। ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনেরও উদ্দেশ্য শেষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যক্তিনিষ্ঠ নয় রষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, তত্ত্বনিষ্ঠ সমাজ গঠন করতে চায়।

বেদব্যাস জয়ন্তী :

এদিন বেদ, পুরাণ ও মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের গুরু মুনি বশিষ্ঠের পৌত্র এবং জ্যোতিষ রচনাকার মহান পরাশর ঋষির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। বেদব্যাসকে 'গুরুদের গুরু' (গুরুণাং গুরু) বলা হয়। সেইজন্য তাঁর জয়ন্তী গুরুপূর্ণিমা রূপে পালন করা হয়। নিজের বংশগৌরব বৃদ্ধি করে এবং জ্ঞানপরম্পরাকে মর্যাদা দিয়ে বেদব্যাস বাল্যকাল থেকেই তপস্যা ও সাধনার মার্গ গ্রহণ করেন। বর্তমান উত্তরাখণ্ডের বদরীনাথ ধামের নিকট বদরিকা

আশ্রমে কঠোর তপস্যা করে জ্ঞানপ্রাপ্ত করেন। উপলব্ধ জ্ঞানের সংরক্ষণের জন্য প্রাচীন বৈদিক রচনার সংকলন ও বিস্তার করেন। মহর্ষি বেদব্যাস সুপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য মহাভারত রচনা করেন, সতেরোটি পুরাণ রচনা করার পর আঠারোতম মহাপুরাণ ভাগবত পুরাণ লেখেন। বৃহৎ ব্যাসস্মৃতি ও লঘু ব্যাসস্মৃতি রচনা করেন। বেদব্যাসকে সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার মনে করা হয়। জগদ্‌গুরু শংকরাচার্য ও গোবিন্দাচার্যের গুরু ছিলেন মহর্ষি বেদব্যাস। মনে করা হয় বেদব্যাস রচিত শাস্ত্রের পঠন, শ্রবণ ও মনন ছাড়া কোনো ব্যক্তি আধ্যাত্মিক গুরুপদ লাভ করতে পারেন না। আজও সনাতন পরম্পরায় প্রবচন ও কথাকারদের আসনকে 'ব্যাসপীঠ' বলা হয়।

মনুষ্য জীবনে গুরুর আবশ্যকতা :

গোস্বামী তুলসীদাস বলেছেন— 'গুরু বিনু হোয় ন জ্ঞান।' কবীরদাসজী বলেছেন— 'গুরু বিন জ্ঞান ন উপজে, গুরু বিন মিলে নে মোষ। গুরু বিন লখে ন সত্য কো, গুরু বিন মৈটে ন দোষ।' বলা হয়েছে— গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুঃ সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। কবীরদাসজী বলেছেন— 'গুরু গোবিন্দ দোউ খড়ে কাকে লাগু পায়। বলিহারি গুরু আপনে গোবিন্দ দিয়ো বতায়।'

গুরুর আশীর্বাদ ছাড়া জীবনে এগোনো মুশকিল। বিবেক জাগ্রত করার জন্য গুরু আবশ্যক। সংস্কার দেওয়ার কাজ গুরুই করে থাকেন। মা আমাদের প্রথম গুরু, সেইজন্য বলা হয় মাতৃদেবো ভব। মা-ই আমাদের শেখান প্রথমে ভাই-বোনকে খাওয়াও তারপর নিজে খাও। এটাই মনুষ্যত্ব।

পিতা শিক্ষা দেন সেইজন্য পিতৃদেবো ভব। আচার্য শিক্ষা দেন সেইজন্য আচার্য দেবো ভব। যজ্ঞ আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা। যজ্ঞ শব্দের অর্থ ব্যক্তিগত জীবনকে সমর্পণ করে সমষ্টি জীবনকে পরিপুষ্ট করা। (রাষ্ট্রায় স্বাহা ইদং রাষ্ট্রায় ইদং ন মম)। যজ্ঞ শব্দের অর্থ হলো সদ্‌গুণরূপী অগ্নিতে অযোগ্য, অনিষ্ট ও অহিতকারী বিষয়গুলি অর্পণ করা। যজ্ঞ শব্দের অর্থ শ্রদ্ধাময়, ত্যাগময়, সেবাময় ও তপস্যাময় জীবন অতিবাহিত করা। যজ্ঞের দেবতা অগ্নি। অগ্নির জ্বালার প্রতিরূপ আমাদের পরম পবিত্র ভগবাধ্বজ।

আমরা জ্ঞানের উপাসক, অজ্ঞানের নয়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অজ্ঞানের প্রতীক অন্ধকার, জ্ঞানের প্রতীক সূর্য। সূর্যনারায়ণের রথের উপর উড্ডীন পতাকাই পরম পবিত্র ভগবাধ্বজ।

পরম পবিত্র ভগবাধ্বজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব :

ভগবাধ্বজ মানে ভগবানের ধ্বজ। আমাদের অনাদিকাল থেকে পরম্পরার বাহক। এই ধ্বজের ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষ বিশ্বগুরুর সম্মান লাভ করেছে। এই স্বর্ণ গৈরিক (স্বর্ণ= ঐশ্বর্য, গৈরিক=ত্যাগ) আমাদের ঐশ্বর্য ও ত্যাগের প্রতীক। ভারতের বলিদানী পরম্পরা ও শৌর্যের প্রতীক।

পরম পবিত্র ভগবাধ্বজের ধর্মীয় গুরুত্ব :

হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক, হিন্দুদের প্রতীক। মঠ, মন্দির, যজ্ঞশালায় এই ধ্বজই উড্ডীন থাকে। সাধু, সন্ত, সন্ন্যাসী ও যোদ্ধাদের এই রংই প্রিয়। ত্যাগ ও সর্বস্ব অর্পণের প্রতীক। জীবনে সদ্ভাবের প্রতীক (উদীয়মান ও অস্তাচলগামী সূর্যের রঙের প্রতীক)।

পরম পবিত্র ভগবাধ্বজের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব :

করোনা আবহে সমাজের অনেকে সংকটে পতিত হয়েছে। এই সময়ে স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘস্থানে পরম পবিত্র ভগবাধ্বজের ছত্রছায়ায় প্রাপ্ত সেবা ও সংস্কারের উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন করেছে (ভোজন ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ, রক্তদান শিবির, আয়ুর্বেদ কাড়া বিতরণ, হোমিওপ্যাথি ওষুধ বিতরণ, প্রশাসনকে সহযোগিতা, দাহসংস্কার প্রবাসী শ্রমিকদের ভোজন ব্যবস্থা, শহর গ্রাম স্যানেটাইজ করা, গোশালা সামলানো, বাস, রেল সহায়তা কেন্দ্র ইত্যাদি)।

শিবো ভূত্বা শিবং যজেৎ— নিজে শিব হয়ে শিবকে পূজা করা উচিত। যে গুরুর সঙ্গে অধিক একাত্ম ও একরূপ হতে পারবে সে-ই গুরুর পূজা করতে পারবে, অন্য কেউ নয়।

আমরা যে গুরুর আরাধনা করছি সেই গুরুর গুণ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে জাগ্রত করা উচিত অন্যথা কর্তব্য (আদর্শ) পূর্তি সম্ভব নয়। আমাদের মনস্থির করা উচিত যে যে ক্ষেত্রে আমরা পদার্পণ করাবো সেই সেই ক্ষেত্রে আদর্শ উপস্থিত করবো।

সমর্পণের অর্থ কী?

খুব উপযোগী বস্তুর সমর্পণ। শ্রদ্ধার সঙ্গে কষ্ট করে স্বার্থের জলাঞ্জলি দিয়ে যা দেওয়া হয়, সেটাই প্রকৃত সমর্পণ। সুখ সাধন তথা অন্য প্রকার উপযোগ সামগ্রী ধনের দ্বারা পাওয়া যায়। সেই ধনের পর্যাপ্ত পরিমাণ আরাধ্য দেবতার সমক্ষে নিবেদন করাই সমর্পণ। এই দ্রব্য সমর্পণ সারা জীবন সমর্পণের প্রতীক এবং প্রকৃত সমর্পণের প্রারম্ভ।

সমর্পণে সংগঠন আত্মনির্ভর হয়। কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। আপনত্ব ভাব জাগ্রত হয়। নিজের সংগঠন এই অনুভূতি জাগে। আত্মনির্ভর ও সমর্পিত হওয়ার কারণে কোনো পরিস্থিতিতেই অসুবিধা হয় না। যেখানে সমর্পণের ভাব থাকে সেখানে অন্তঃকরণ শুদ্ধ থাকে। সমর্পণ যত বৃদ্ধি পায় জীবনে সৌম্যভাব, সরলতা, শুদ্ধতা ও নির্মলতা ঈশ্বরের কৃপায় বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

সমর্পণ কীভাবে?

প্রকৃত সৎ ভাবনা থেকে অধিকাধিক সমর্পণ করা আমাদের কর্তব্য। আমরা কত সমর্পণ করছি এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো কীরকম চেষ্টা ও কোন ভাবনায় সমর্পণ করছি। কাজের আবশ্যকতা অনুসারে অধিকাধিক সমর্পণ করা উচিত। যেরূপ সঙ্ঘকাজের জন্য প্রতিদিন সময় দিই সেরূপ দৈনিক সমর্পণ থেকে আমরা অধিক সমর্পণ (গুরু দক্ষিণা) করতে পারি। ধনের দ্বারা সেবা করলে ধনের প্রতি মোহ কমে যায়। তনের দ্বারা সেবা করলে দেহের প্রতি অভিমান কমে যায়। মনের দ্বারা সেবা করলে মনে শান্তি পাওয়া যায়— শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্। শ্রিয়া (শ্রেষ্ঠ) দেয়ম্।

(শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ)

শ্যামাসংগীত সাধক নজরুল

সুদীপ পাল

বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভা নজরুল ইসলাম যেন কক্ষচ্যুত ধূমকেতু। কবির ১২২তম জন্মজয়ন্তীতে আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কবির জীবনজুড়ে রয়েছে তাঁর বৈচিত্র্যময় কাজ। ছিলেন মুয়াযযিন, হয়েছেন শিক্ষক। সেসব ছেড়ে হলেন লেটোদলের সদস্য। এরপর রুটির দোকানে কাজ নেওয়া, বাসাবাড়িতে কাজ করা, সেনাবাহিনীতে যোগদান, সাংবাদিকতা, গীতিকার, সুরকার, গায়ক— কোথায় তাঁর পদচারণা নেই? দুরন্ত, তেজস্বী এই ব্যক্তি ছুটে বেড়িয়েছেন দেশের নানা প্রান্তে। কবির সব চঞ্চলতা স্থির হয়েছে ঢাকায় এসে। জীবনাবসানের পর শুয়ে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে। যাঁর জন্ম ভারতের বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে, কর্মব্যাপ্তি পশ্চিমবঙ্গে এবং মানুষটির শেষ আশ্রয় ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা কাজী ফকির আহমেদ ছিলেন মাজারের খেদমতগার ও স্থানীয় মসজিদের মুয়াযযিন। নজরুল ছোটোবেলায় স্থানীয় মক্তবেই পড়াশোনা শুরু করেন। কিন্তু মাত্র নয় বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হলে তিনি পড়েন অকূল পাথারে। নজরুল ছিলেন তার পিতার দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান। একে দ্বিতীয় পক্ষীয়, তার ওপর আবার বিশাল পরিবার হওয়ায় নজরুলের দুঃখের সীমা ছিল না। বাপ-মরা ছেলেটিকে গ্রামের সবাই দুখুমিয়া বলেই ডাকত। দারিদ্র্যের কারণেই নজরুলকে অল্প বয়সে অর্থ উপার্জনের পথ ধরতে হয়। যে মক্তবে তার হাতেখড়ি সেখানেই মাত্র দশ বছর বয়সে শিক্ষক হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন। কিন্তু যিনি সারা দেশকে শিক্ষা দেবেন তিনি কি আর একটি প্রতিষ্ঠানেই আবদ্ধ থাকবেন? না থাকবেন না। তাই অচিরেই চুরুলিয়ার সেই দুখুমিয়া হয়ে উঠলেন বাঙ্গলার আদরের কবি নজরুল।

ইতিমধ্যে বিশ শতকের উষালগ্নে (১৯১৪-১৯১৮) বিশ্বের প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। যুবক কাজী নজরুল ইসলাম ৪৯ বাঙ্গালি পল্টনভুক্ত হয়ে যোগ দিলেন এই যুদ্ধে। যুদ্ধান্তে ১৯১৮ সালের পর হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলাম ফিরলেন একদা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা মহানগরীতে। এই মহানগর কলকাতা তখন ব্রিটিশবিরোধী নানা আন্দোলন, সংগ্রামে অগ্নিগর্ভ। ভারতজুড়ে চলছে গান্ধীজীর চরকা আন্দোলন-সহ অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, স্বদেশি আন্দোলন। ১৯২২ সালে সহসাই কবিকণ্ঠে বেজে উঠল অগ্নিবীণা— 'আমি স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু/আমি বার বার আসি, /আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু।'

এক বিদ্রোহী কবিতা দিয়েই কবি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন বাঙ্গালি সমাজে। তারপর আর তাকে পেছনে

ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক জীবনমুখী কাব্য, কবিতা, সংগীতে, নাটকে, উপন্যাসে, গজলে, গানে ও শ্যামাসংগীতে ভরে তুললেন বাংলা সাহিত্যের আঙিনা। সংগ্রামী জনতাকে দিলেন তাদের প্রত্যাশিত সংগ্রামের ভাষা। লিখলেন আনন্দময়ীর আগমনে। সরকারি রোষে পতিত হলেন কবি। অতঃপর গ্রেপ্তার হলেন তিনি। কবির ওপর চলল নানা জুলুম, অত্যাচার। কারাগারে বসেই কবি গাইলেন শিকল ভাঙার দুর্বার সংগীত— 'কারার ওই লৌহ কপাট/ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত-জমাট/শিকল পূজার পাষাণ বেদী,/যতসব বন্দিশালা, আগুন জ্বালা,/ফেল উপাড়ি'। তৎকালীন সশস্ত্র

বিপ্লবের কর্ণধার বিপ্লবী বারীন ঘোষের মতাদর্শে দীক্ষা নিলেন কবি।

দেশভাগের পর কবি অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন— 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে/ভাগ হয়নিকো নজরুল'। কিন্তু ঘটনার পরম্পরা এমনভাবেই ঘটতে শুরু করলো যে নজরুলের লেখা সাহিত্য সংগীত নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্নদাশঙ্কর রায় আবার কলম ধরলেন। লিখলেন, 'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল/এতকাল পরে ধর্মের নামে/ভাগ হয়ে গেল নজরুল'।

নজরুলকে প্রথম ভাগ করার চেষ্টা করেছিল পশ্চিম পাকিস্তান। তারাই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন বাতিল করতে হবে নজরুল কাব্যে অবাঞ্ছিত অংশ। এই অবাঞ্ছিত অংশে পশ্চিম পাকিস্তানিরা দেখেছিলেন কবির কাব্যে ও সংগীতে হিন্দু দেব-দেবীর মহিমা প্রকাশ। কিন্তু তারা এটুকু খেয়াল করেননি কবি বিয়ে করেছিলেন হিন্দু পরিবারের মেয়ে প্রমীলা সেনগুপ্তকে। এমনকী কবি তাঁর পুত্রদের নামের ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলিম দুটি নামের সমীকরণে রেখেছিলেন কৃষ্ণ মোহাম্মদ, কাজী সব্যসাচী, কাজী বুলবুল ও কাজী অনিরুদ্ধ।

নজরুল রচিত শ্যামা সংগীতের দিকে তাকালে আমরা দেখি এই সংগীত আসলে আত্মসচেতনতা এবং আমিত্ব বিসর্জনের কথাই বলে। সংগীতে রয়েছে দেশপ্রেম এবং অহিংসা পরায়ণতার কথা।

একদিকে দেশমাতৃকার বন্ধন, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক উন্নতি— দুটির মেলবন্ধন ঘটিয়ে দিলেন নজরুল। শ্যামা সংগীত রচনা করলেন। লিখলেন— 'বলরে জবা বল/কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল/ মায়া-তরুর বাঁধন টুটে/মায়ের পায়ে পড়লি লুটে/মুক্তি পেলি/উঠলি ফুটে আনন্দ বিহ্বল'।

একজন সাধক যখন ইষ্ট দেবতা বা দেবীর প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হন তখন সেই দেবতার সঙ্গে সাধকের গড়ে ওঠে একটি নিবিড় সম্পর্ক। সংসারের আর দশটা সম্পর্কের মতোই এই সম্পর্কেও আছে রাগ- অভিমান-ভালোবাসা, সর্বোপরি আত্মনিবেদন। শ্যামা মাকে কবি নজরুল একদিকে যেরকম মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন, অন্যদিকে সেই মাকেই দেখেছেন কন্যারূপে। সেই কন্যার রাগ হয়েছে, অভিমান হয়েছে। অভিমান ভোলাতে তিনি লিখলেন— 'আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে/কে দিয়েছে গালি/রাগ করে সে সারা গায়ে/মেখেছে তাই কালী'।

বহুত্ববাদী হিন্দুধর্মে শাক্ত ও বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। সেই বিভেদ ঘুচিয়ে নজরুল তাঁর নিজস্ব সাধনা দিয়ে অনুভব করে লিখেছেন— 'শ্যামামায়ের কোলে চড়ে/ জপি আমি শ্যামের নাম/মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু/ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম'।

১৯৪২ সালে কবি অসুস্থ হন। বাকশক্তি ও স্মৃতিশক্তি হারিয়েও তিনি জীবিত ছিলেন ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ জীবনের শেষ ৩৪ বছর তিনি নীরবতায় কাটিয়েছেন। নীরবতায় না থাকলে কবির থেকে আমরা পেতাম আরও নতুন কাব্য, নতুন গান, নতুন কবিতা। □

গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ভুলে ভারতে বিভেদের রাজনীতির গোড়াপত্তন

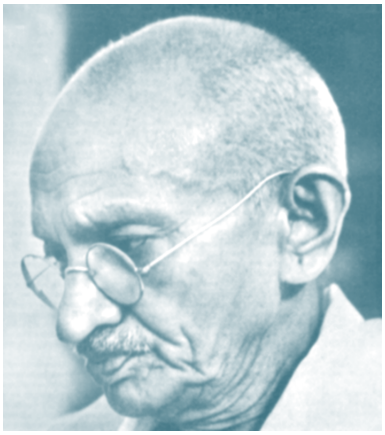

ডঃ নারায়ণ চক্রবর্তী

আজকাল আমরা সেজেগুজে থাকা 'সাজানো' বিদ্বান মানুষদের কাছে প্রায়শই একটি কথা শুনে থাকি—দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সর্ববৃহৎ দল 'বিভেদের রাজনীতি' করছে! এই 'বিভেদ'-এর রাজনীতি কী এবং কীভাবে দেশে বিভেদের রাজনীতি এল এবং কখন শুরু হলো তার বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। এখানে গত একশো বছরে দেশের ঐতিহাসিক চরিত্র, স্বাধীনতার পটভূমি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশের সংবিধান ও তার বেআইনিভাবে সংশোধন উল্লেখে আলোচনা করা হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাংবাদিকসুলভ আষাঢ়ে গল্পের সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের রাস্তায় হাঁটা হয়নি। যখন স্বাধীনতার আন্দোলন ধীরে ধীরে গণ-আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে তখন দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত এক কলেজ ড্রপ-আউট ইনফরমাল ল-ইয়ার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে এক নতুন দিশা দিলেন। কীভাবে? ১৯২০ সালে, যখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হচ্ছে, তখন তিনি এমন একটি পদক্ষেপ করলেন যে তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেশের ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিপন্থী হলো। এই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পরবর্তীতে 'জাতির জনক' হিসেবে চিহ্নিত হন। গান্ধীজী কংগ্রেস পার্টির স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে দেশের মুসলমান সমাজকে জুড়ে দিয়ে সকলের অবিসংবাদী নেতা হতে চেয়েছিলেন। তার জন্য পুরোপুরি মুসলমানদের একটি ধর্মীয় আন্দোলনকে তিনি হিন্দু অধ্যুষিত কংগ্রেস পার্টি তথা দেশের তাবৎ হিন্দুদের হয়ে সমর্থন করেন। আন্দোলনটি হচ্ছে খিলাফত আন্দোলন। তুরস্কে খলিফার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করার ইসলামি প্রয়াস। তিনি মুসলিম ভ্রাতৃদ্বয় সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি এবং আবুল কালাম আজাদের মতো মুসলমান নেতাদের তাঁর প্রবর্তিত 'অসহযোগ' আন্দোলন সমর্থন করার শর্তে খিলাফত আন্দোলনকে হিন্দুদের সমর্থন করার ডাক দেন। খিলাফত একটি ধর্মীয় আন্দোলন। এই ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব কায়েমের জন্য একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের সমর্থন করার যুক্তি দিয়ে তিনি ঐতিহাসিক ভুল করেছিলেন। এর মাশুল এখনো এই উপমহাদেশের আপামর জনসাধারণ দিয়ে যাচ্ছেন। ওই সময় গান্ধীজীকে মানুষ নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে বারবার একগুঁয়েমির প্রমাণ রেখেছেন। নিজের মতকেই একমাত্র গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে কৌতূহলের সৃষ্টি করলেও তা যে ব্রিটিশরাজকে খুব অসুবিধায় ফেলে স্বাধীনতা পেতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলে না। আর চরকা কেটে প্রতীকী প্রতিবাদ করা যায়—কার্যকরী প্রতিবাদ নয়। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণগুলি আলাদা।

গান্ধীজীর এই ঐতিহাসিক ভুলের মাশুল আমরা কীভাবে দিচ্ছি? প্রথমত, খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগণের কোনোভাবেই কোনো যোগসূত্র থাকার কথা নয়। শুধুমাত্র গান্ধীজীর বৃহত্তর নেতা হওয়ার ইগো পরিতৃপ্তির জন্য মুসলিম নেতাগোষ্ঠীর ধর্মীয় আন্দোলনকে হিন্দুদের সমর্থন করা তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী একটি হাস্যকর সিদ্ধান্ত। অতঃপর খিলাফত আন্দোলন তেমন গতি পেল না। ওদিকে এর পীঠস্থান তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক অটোমান সাম্রাজ্যের অবসানের পর খলিফার শ্রেষ্ঠত্বের সুযোগও ১৯২৪ সালে শেষ করে দিলেন। এদিকে গান্ধীজীকে মুসলমান নেতারা ব্যবহার করেছিলেন, নিজেরা ব্যবহৃত হননি। হুসেইন সুরাবর্দি, মহম্মদ আলি জিন্নার মতো নেতারা দেখলেন যে আন্দোলনের রাশ নিজেদের হাতে নিতে হলে মুসলমান সমাজের নেতা হতে হবে। তখন মুসলমানদের তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করার কাজ শুরু হলো। এর প্রথম পর্বে যে মোপালা বিদ্রোহ শুরু হয়, যার নেতৃত্বে ছিল আলি মুসলিয়ার, কুঞ্জ আহমেদ হাজি ইত্যাদি, তাতে কার্জনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে অন্তত ২৫০০ জন মোপালা জেহাদি মারা গেছিল এবং দশ হাজার হিন্দুকে জেহাদির বিদ্রোহীরা হত্যা করে শুধুমাত্র মুসলমান না হওয়ার অপরাধে। অন্তত এক হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়, অজস্র হিন্দু মহিলা ধর্ষিতা হন ও হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুঠ করা হয়। মালাবারের ইয়ারানাদ, ভাল্লুবাঁধ এই দুটি তালুকের একটি হিন্দু বাড়িও অক্ষত ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের উপর রাগের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে হিন্দুনিধনে পর্যবসিত হলো সেকথা লুকানোর জন্য কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইতিহাসে এই হত্যাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। মোপালা বিদ্রোহকে

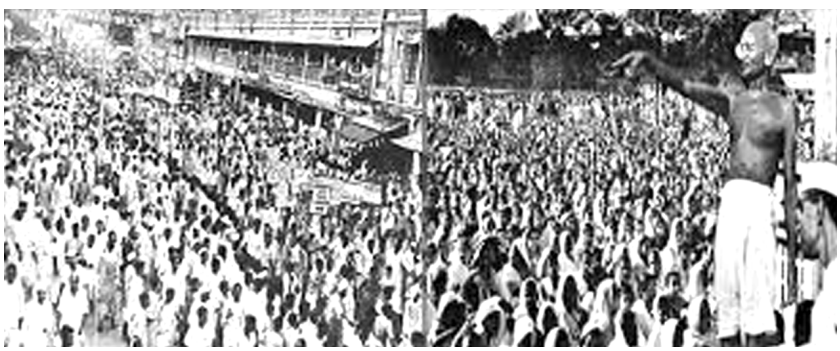

ফিলাফৎ আন্দোলনে গান্ধীজী

ফ ঃ ৫

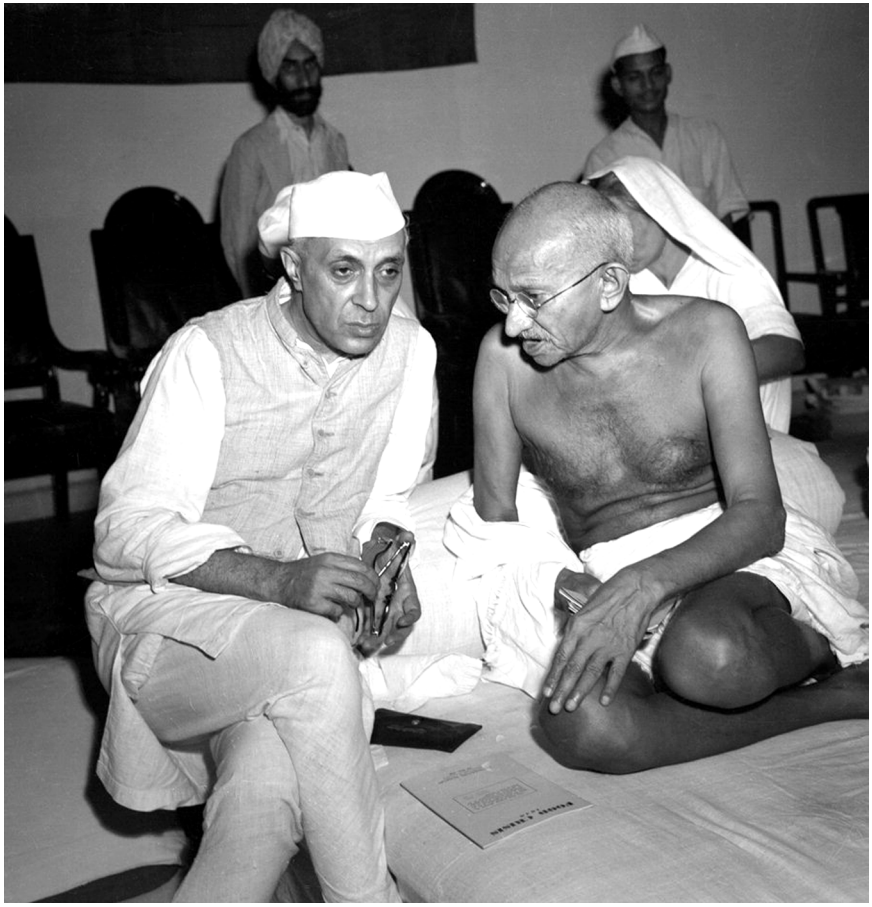

পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে শলাপরামর্শে গান্ধীজী।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে হিন্দু জনগণের উপর মুসলমান জেহাদিদের অত্যাচারকে গুরুত্বহীন করতে চেষ্টা করেন কমিউনিস্ট ভাবদর্শে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকেরা। এই সময় বেশ কিছু কংগ্রেসের নেতা মোপালা বিদ্রোহকে সমর্থনের বিপক্ষে মত দেন। তখন গান্ধীজী জনসমর্থন হারানোর ভয়ে পিছিয়ে যান। গান্ধীজী সাময়িকভাবে পিছু হটেন। কিন্তু তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যৌথ নেতা হওয়ার নেশায় ভারতকে এক দ্বিজাতিতত্ত্বের দোরগোড়ায় এনে দিলেন। বলতে দ্বিধা নেই, অল্প শিক্ষিত গান্ধীজীর তুলনায় (উনি ম্যাট্রিক পাশ করার পর ভাবনগরের কলেজ ড্রপ আউট, পরবর্তীতে উনি ১৮৮৮ থেকে ১৮৯১ অবধি informal auditing ছাত্র হিসেবে ছিলেন। যদিও ব্যারিস্টার হিসেবে তিনি মুম্বাই হাইকোর্টে রেজিস্টার্ড ছিলেন, ল পাশ করার কোন formal ডিগ্রি তাঁর ছিল না)। তখনকার শিক্ষিত ব্যারিস্টার মুসলিম নেতাদের রাজনৈতিক দুরদর্শিতা অনেক বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, গান্ধীজীর নিজের নীতি তা যতই অবাস্তব হোক, সেটাই অনুসরণ করার একগুঁয়েমির মূল্য ভারতবাসীকে দিতে হয়েছে। মোপলা বিদ্রোহ ও তার দমনের সময় বোঝা গিয়েছিল মুসলিম নেতাদের প্রভুত্ব করার উদগ্র কামনা এবং হিন্দুদের প্রতি অসহনশীলতা, আর তা সফল করার সোজা উপায় ছিল হিন্দুদের হত্যা, ধর্ষণ ও তাদের সম্পত্তি দখল অথবা তাদের ধর্মান্তরকরণ। মনে রাখতে হবে, আধুনিক ভারতে হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের সূচনা হয় এই মোপালা বিদ্রোহের সময়ই। এর দায় গান্ধীজী এড়াতে পারেন না। পরবর্তীকালে ১৯৪৬-৪৭ সালের ভারত বিভাজনের সময়ও গান্ধীজী হিন্দুনিধন আটকানোর জন্য কোনো কার্যকরী ভূমিকা নেননি। এমনকী মুসলিম নেতাদের দ্বারা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় তিনি হিন্দুদের উপর অত্যাচারে কোনো বাধা দেননি। পক্ষান্তরে, যখন হিন্দুরা প্রতিরোধ শুরু করে তখন তিনি নিজে ছুটে এসে শান্তির বাণী ছড়ালেন।

একই রকমভাবে নোয়াখালির হিন্দুনিধনের সময় তিনি হিন্দুদের বাঁচানোর কোনো চেষ্টা করেননি। সুতরাং একথা আজ মানতে হবে, প্রথমদিকে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে না নিলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও বিশেষত গান্ধীজীর একাধিক ভুল পদক্ষেপ ক্রমশ জিন্না, সুরাবর্দি, সৌকত আলিদের মুসলমান মানুষদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। আমাদের একটি বদ্ধমূল ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, গান্ধীজী সবরকম অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু সেটা বোধহয় ঠিক নয়। দক্ষিণ অফ্রিকার কোর্টে সওয়াল করতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়, ''We are fellow members of the Empire. You should not be discriminating against us. We are not like these black people. We are better than they are. We are different from them. And you should not treat us like them.'' অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য ছিল, আমরা ভারতীয়রা ব্রিটিশদের মতোই মহান সাম্রাজ্যের প্রজা। সুতরাং ব্রিটিশ সাদা চামড়ার মানুষদের মতোই আমাদের ব্যবহার পাওয়া উচিত। কিন্তু কালো চামড়ার মানুষরা নিকৃষ্ট। তাদের থেকে ভারতীয়রা উৎকৃষ্ট। সুতরাং তারা ব্রিটিশদের সমান। অর্থাৎ তিনি যে কালো মানুষদের নিকৃষ্ট মনে করতেন তা তাঁর বক্তব্যে পরিষ্কার। গান্ধীজী সর্বদা হিন্দুদের মধ্যে যে বিভিন্ন socio-economic বিভেদ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। অহিংস উপায়ে হিংসার মোকাবিলা করার মতো অবাস্তব পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন sect-এর বিভেদ নিয়ে হয় তাঁর কোনো ধারণা ছিল না, না হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের নেতা হিসেবে থাকার বাসনায় সর্বদা মুসলমানদের একটা ইউনিট হিসেবে দেখেছেন। সেটা মুসলমানদের মধ্যে communal feeling তৈরিতে প্রভূত সাহায্য করেছে। জিন্না যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতকে তিন টুকরো করে তার দুটুকরো মুসলমানদের দেওয়ার যুক্তি দিলেন, তখন গান্ধীজী মৌখিকভাবে তার বিরোধিতা করলেও 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান' এর নামে হিন্দু নিধন থামানোর চেষ্টা করেননি। ফলে দেশভাগ হলো। স্বাধীনতা এলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগাভাগি করে। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) দুটিই ইসলামিক দেশ হলো, ভারত হিন্দুদের বাসভূমি হিসাবে রইল। তখন বিশেষত গান্ধীজীর প্রভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতকে সকল ধর্মের মানুষের বাসস্থান হিসেবে ঘোষণা করল! ফলে ভারতীয় মুসলমানদের homeland পাকিস্তান হলেও ভারতীয় হিন্দুদের কোনো homeland হলো না। ভারতের সংবিধানে সকল নাগরিকের ধর্মপালনের সমান অধিকার স্বীকৃত হলো। মৌলিক অধিকার ২৫, ২৬ এবং সরকারের কর্তব্যকর্ম ২৯, ৩০ ধারায় সংবিধানে লিপিবদ্ধ হলো। তারপর কাবেরী, গঙ্গা, যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়ালো। কংগ্রেসের, বিশেষভাবে নেহরুর soft peedaling এর কারণে কাশ্মীরের একটা বড়ো অংশ পাকিস্তানের কবলে চলে গেল। ১৯৬২ সালে চীনের আগ্রাসনের কাছে ভারত

পর্যদুস্ত হলো। গান্ধীজীর অহিংস নীতি তাঁর যোগ্য শিষ্য জওহরলাল নেহরু পালন করতে গিয়ে দেশের বিদেশনীতিকে যারপরনাই পর্যুদস্ত হওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে পরপারে চলে গেলেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অল্প সময়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু করার সুযোগ ছিল না। তারপর জওহরলাল নেহরুর উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রিত্বে আসীন হলেন তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। তিনি কংগ্রেসের মধ্যে সোশালিস্ট লবির সাহায্য নিয়ে বয়স্ক ও প্রাচীনপন্থী নেতাদের তাড়ালেন। একাজে তাঁকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট মদন দিলেন দেশীয় কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত রাশিয়া। ইন্দিরার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল কী করে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা যায়। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে তিনি যখন প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর সম্মুখীন হলেন, দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে কার্যকরীভাবে একনায়কতন্ত্রী ব্যবস্থায় দেশকে নিয়ে গেলেন। সেই সময় তিনি পার্লামেন্টকে এড়িয়ে ভারতের সংবিধানের এমন দুটি সংশোধন করলেন যা ভারতের অস্তিত্বের ভিত্তিই নাড়িয়ে দিল। এতে একাধারে সংবিধানের মৌলিক ধারাগুলির বিরোধিতাই করা হলো তাই শুধু নয়, সংবিধানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে স্ববিরোধিতার সূচনা হলো। তিনি ভারতকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' ও 'প্রজাতান্ত্রিক' দেশ বলে ঘোষণা করলেন। যেহেতু তখন পার্লামেন্ট বন্ধ করে রেখেছিলেন, পার্লামেন্টে আলোচনা সাপেক্ষে এই সংশোধন হয়নি। কিন্তু তারপর যে সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকার এসেছে তারা কেন এই সংশোধনী দুটি বাতিল করল না; অন্তত সংশোধন করল না তা বোঝা গেল না।

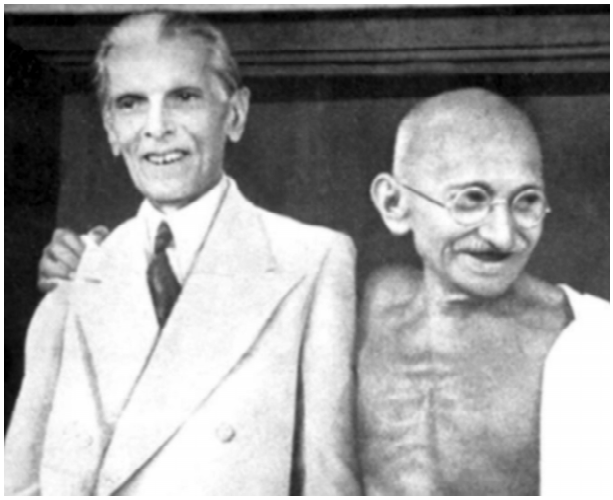

জিন্নাহর সঙ্গে গান্ধীজী

আসলে এই 'বেআইনি' সংশোধনের উদ্দেশ্য অনেক গভীরে। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যার ব্যাপারটা তাঁর সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের হাতে ছেড়ে দিলেন। এই প্রসঙ্গে বহুচর্চিত একটা জিনিস ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বাইবেল ও কোরান দুটি ধর্মগ্রন্থেই 'ধর্মনিরপেক্ষ' মানুষদের ধর্মচ্যুত মানুষ হিসেবে দেখা হয়। এদের স্থান বিধর্মীদের চেয়েও নীচে। সেজন্য কোনো ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান বা মুসলমান কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হয় না। যেজন্য কোনো দেশে মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণে যখন সেই দেশ ইসলামিক দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়, প্রথমেই ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী কমিউনিস্টদের তারা বিনাশ করে। যাক সে কথা। এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার টার্গেট করা হলো হিন্দুদের। এখানে একটা পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে যে, ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের দিন থেকে তারা দুটি বিষয়ে কখনো বিচ্যুত হয়নি। প্রথম, ভারত রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করা, দ্বিতীয়, জেহাদি ইসলামকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপায়ে তোল্লা দেওয়া। এর হাজার উদাহরণ আছে। সুতরাং ইন্দিরা গান্ধী যখন 'ধর্মনিরপেক্ষতা' দেশের মানুষদের গেলানোর দায়িত্ব তাঁর সোশ্যালিল্ট ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের দিলেন, তখন থেকেই ভারতীয় কমিউনিস্টদের সৃষ্ট 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রচারের আলোতে এলো। এর যে রূপ আমরা দেখলাম তাতে নিশ্চিতরূপে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর সময় থেকে দেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক কাঠামো ধরে রেখে manipulative democracy শুরু হলো। এখন তার কদর্যতম রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। যাক, ফিরে আসি ধর্মনিরপেক্ষতায়। যেহেতু মুসলমান ও খ্রিস্টানদের ধর্ম বিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ওই দুই ধর্মকে, বিশেষত ইসলাম থেকে সরকারি স্তরে তোল্লা দিয়ে শুরু হল সরাসরি হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা। ইন্দিরা গান্ধীর পুত্র রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে হিন্দুদের মস্তিষ্ক প্রক্ষালন ব্যাপকভাবে শুরু হলো। এই কাজের সঙ্গে দেশের প্রাচীন ইতিহাস চর্চা বন্ধ করে মুসলমান আক্রমণকারী শাসকদের মহত্ত্ব ও দেশ গঠনে তাদের অবদান নতুন করে কমিউনিস্ট প্রভাবিত ইতিহাস বই রচনায় জায়গা করে নিল। এর একটি চরম নির্লজ্জ উদাহরণ হল মোপলা বিদ্রোহের ইতিহাস নিয়ে সিপিআইএম-এর নিকৃষ্ট মিথ্যা ভরা 'দলিল'। এখানে হিন্দু নিধনকারী জেহাদিদের দেশপ্রেমিক দেখিয়ে শুধু হিন্দু হওয়ার অপরাধে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে একটি কথাও খরচ করা হলো না! সেই শুরু। তারপর, কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিত, যারা ট্রাডিশানালি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন, তাদের হত্যা, ধর্ষণ, ধনসম্পত্তি লুঠ করে কাশ্মীরকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেহাদিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হলো। তারপর ধীরে ধীরে যখন হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল তখন হিন্দুদের মধ্যে দলিত, পিছড়ে বর্গ, অতি পিছড়েবর্গ এই সব শ্রেণী বিন্যাসে হিন্দু একীকরণে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হলো। তার সাথে দেশে সরকারি সহায়তায় ও অর্থানুকূল্যে মুসলমানদের উন্নয়নের নামে ইসলামিক কনসোলিডেশান শুরু হলো। মদত দিল চীন ও পাকিস্তান। তাদের ব্যাপারে মৌনব্রত অবলম্বন করে নিজেদের ঘৃণ্য কাজ চালিয়ে যেতে লাগল কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা। তারপর ধীরে ধীরে মার খেতে খেতে হিন্দু একীকরণ শুরু করার কাজ যে সংগঠনগুলি শুরু করল তাদের উপর সরকারি, জেহাদি ও কমিউনিস্টদের আক্রমণ নেমে এলো। তা সত্ত্বেও হিন্দু কনসোলিডেশান প্রাধান্য পাচ্ছে। যত আক্রমণ নেমে আসছে, হিন্দুদের জোটবদ্ধ হওয়া তত গতি পাচ্ছে।

পরিশেষে একটি কথা বলার আছে। যে মুহূর্তে ভারত আবার টুকরো করার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে তখন কয়েকটি নতুন জেহাদি দেশের জন্ম হবে, যেখানে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট কোন দলেরই অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে ১৯৭৬ সালে কালো দিনের সাহায্য নিয়ে সংবিধানে যে দুটি পরিবর্তন করা হয়েছিল তা বাতিল করা আশু প্রয়োজন। দেশধর্ম ছাড়া কোনো রাষ্ট্র থাকে না। সুতরাং ভারতের রাষ্ট্রধর্ম হোক হিন্দুত্ব যা সকল religion-কে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাহলে কোনো শক্তি আর ভারতকে টুকরো করতে পারবে না। ◘

ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি হলো পশ্চিমবঙ্গে, সৌজন্যে রাজ্য সরকার

বিশ্বপ্রিয় দাস

যাক এবার মারণযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল বর্তমান শাসক দলের সৌজন্যে। বিষয়ে যাবার আগে মনে পড়ে গেল সেই শৈশবের একটি ছবি। ছোটোবেলা থেকে তিনটি বাঁদরের বিশেষ ভঙ্গিমায় ওই ছবিটি দেখতাম আর ভাবতাম, ওরা ওরকম ভাবে বসে আছে কেন? কী বলতে চাইছে? কী বোঝাতে চাইছে? এক সময়ে ধৈর্যের স্থিরতা হারিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা ওইরকম ভাবে বসে আছে কেন? উত্তর পেয়ে বেশ লেগেছিল। উত্তর পেয়েছিলাম, যে বানরটি তার হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছে তার নাম 'মিজারু', সে খারাপ কিছুই দেখে না। যে কানে হাত দিয়ে বসে আছে, তাঁর নাম 'কিকাজারু', সে খারাপ কিছুই শোনে না। আর শেষের জন আইওয়াজারু, মুখ চেপে রেখে খারাপ কোনো কথা বলে না। 'দ্য থ্রি ওয়াইজ মাংকিজ' বা তিন জ্ঞানী বানর নামে পরিচিত এই তিনটি বানর আসলে একটি প্রবচনের সচিত্র রূপ। প্রবচনটি হলো, 'See no evil, hear no evil, speak no evil'। সত্যি তো আমাদের শাসক দলের অবস্থা ঠিক এইরকম। যা খারাপ কিছুই ঘটে তা এরা ঠিক এভাবেই এদের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। রাজ্য জুড়ে ভোট পরবর্তী যে রাজনৈতিক হিংসার বাতাবরণ শাসক দলের সৌজন্যে হচ্ছে, সেটিও ঠিক এভাবেই শাসক দলের মানুষজন তাঁদের বক্তব্যে বারে বারে বলছেন। তাঁদের দেখলে মনে হচ্ছে ওই তিন জ্ঞানী বানরের মতোই এরা। ঠিক যে ভাবে এরা সারা বিশ্বের ভয়ংকরতম ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে একটি অধ্যায়ের সূচনাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছে, ওই তিন জ্ঞানীর মতোই।

শাসক দলের এই ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়ে অবস্থান ঠিক কী, তা বুজে উঠতেই পারছে না আপামর জনসাধারণ। কেননা একজন ব্যক্তি এই শাসক দলের জমানায় প্যারালাল কলকাতা পুরসভা চালিয়ে, নিজেকে পুর কমিশনার সাজিয়ে রাজ করে গেল, আর শাসক থেকে প্রশাসন কারোর চোখেই পড়ল না। এমনকী স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনীয় সেই কলকাতা পুলিশের থানার একেবারে নাকের ডগায় বসে এমন একটি কাণ্ড ঘটে চলল, সেটাও নজরে এল না। এই পুলিশ বাহিনী আবার গত কয়েকদিন আগেই নিউ টাউনে দুই আন্তর্জাতিক দুষ্কৃতীকে নিকেশ করে বাহবা পেয়েছিল সবার কাছ থেকেই। তাহলে কী এমন জ্যামার লাগানো রয়েছে এই ভুয়ো আইএএসের গায়ে যে, নাকের ডগায় থাকলেও হদিশ পাচ্ছিল না। দুর্জনেরা বলবেন, পেলেও না পাওয়ার ভান করে গেছেন সবাই। হয় প্রশাসনের এমন সব মানুষের চামড়া দিয়ে বর্মে সারা গা ঢাকা ছিল, যে সেই বর্ম ভেদ করার সাহস কেউ দেখাতে পাচ্ছিলেন না। কথায় আছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে না বেরিয়ে পড়ে। সে জন্যই হয়তো গা থেকে ঝেড়ে ফেলার একটা প্রচেষ্টা শাসক দলে তৈরি হয়েছে।

এই দায় কার? প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সেটাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা হলো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম করে, শুধু নাম নয় সেই প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্য যা কিছু দরকার, সবগুলোই যেখানে একেবারে আসলের মতো করে মানুষের কাছে পৌঁছাল, আর সেখানে ওই ব্যক্তি, মানে আজকের বিখ্যাত ব্যক্তি দেবাঞ্জনের আইএএস-এর ভুয়ো পরিচয় কেউ ধরতে পারল না। সরকারি অনুষ্ঠানে হাজির মন্ত্রী থেকে সান্ত্রীরা কেউ চিহ্নিত করতেও পারল না আইএএস বা জয়েন্ট কমিশনারের ভুয়ো বিষয়টাকে। সেখানেও প্রশ্ন উঠছে, কার ছত্রছায়ায় এই ব্যক্তির শ্রীবৃদ্ধি? কেই-বা দেবাঞ্জনকে সামনে রেখে খেলে যাচ্ছিল। অবশ্য নির্বাচনের আগে চালু করা সেই স্লোগান মনে পড়ে গেল, 'খেলা হবে'। সত্যিই তো বিপুল ভোটে জিতে আসা সরকার সাধারণ মানুষের জীবন নিয়েই তো খেলল। আর চোখ বুঝে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বুঝিয়ে দিচ্ছে, মানুষের থেকে রাজনীতিটাই আগে।

ভুয়ো ভ্যাকসিন। তাও আবার এই করোনা অতিমারীর সংকটকালে মানুষ যখন একটু বাঁচার

জন্য খড়কুটোর মতো কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে, সেই সময় মানুষের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভ্যাকসিনের নামে পাউডার গোলা জল মানুষের শরীরে ঢুকিয়ে দিল। যে ভ্যাকসিন তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বস্ব পণ করে লড়ে চলেছে, একেবারে বিনামূল্যে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে রক্ষা করতে চাইছে আপামর ভারতীয়ের জীবন। সেই সময়ে রাজ্যের শাসক দলের নেতাদের এই ভ্যাকসিন নিয়ে রাজনীতির আড়ালেই বেড়ে উঠেছে এই ভুয়ো ভ্যাকসিনের জল্লাদরা।

উত্তর কলকাতার একটি সরকারি কলেজ সমেত শহরের নানা জায়গায় বহু মানুষ নিয়েছেন ভুয়ো ভ্যাকসিন। এমনকী রাজ্যের শাসক দলের এক সাংসদের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছে ক্যাম্প। তিনি নিজে নিয়েছেন এই ভুয়ো ভ্যাকসিন। তাঁর উপস্থিতি ভরসা জুগিয়েছে আর পাঁচটা সাধারণ মানুষের মনে। তারাও নিয়েছেন। ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের নায়ক জনসেবার নামে একদিকে যেমন এই শাসকদলের হেভিওয়েট নেতাদের কাছাকাছি থাকার সুযোগ করে নিয়েছেন নানা ভাবে, তেমনি এই ঘনিষ্ঠতার ছবিকে সামনে রেখে নিজের প্রভাবের মাকড়শার জাল বিছিয়েছেন, আর সেই জালে একের পর এক দুষ্কর্মের ঘটনা ঘটিয়েছেন ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের নায়ক।

রাজ্যের শাসক দলের নেতা বা নেত্রীরা এখন গা থেকে ঝেড়ে ফেলার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের মূর্তি উদ্বোধনে ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের নায়ক অনেকের সঙ্গেই মঞ্চ ভাগ করে নিয়েছিলেন। সেই উদ্বোধনের ফলকে মন্ত্রীদের সঙ্গে ভুয়ে পরিচয়ের নায়কের নামও ছিল একেবারে উজ্জ্বল ভাবে। এটা সামনে আসতেই ভেঙে ফেলা হলো সেই ফলক। নেতারা ভাবলেন, যাক বাবা, আর প্রমাণ রইল না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও আসরে নেমে প্রমাণ করতে চাইলেন, তাঁদের কারোর সঙ্গেই এই নায়কের কোনো সম্পর্ক নেই। এ যেন সেই গল্পের নেত্রী, যিনি তাঁর দলের সদস্যদের বাঁচাতে যে কোনো উপায় অবলম্বনে ওস্তাদের মতো। যাই হোক, নায়কের প্রভাব প্রতিপত্তি কী করে এতটা বৃদ্ধি পেল, সেটা কেন তদন্ত করে দেখতে চাওয়া হলো না? এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের অবতারণা না করলেই নয়, এক সাংসদের মাধ্যমেই এই ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডের পর্দা ওঠে। তারপর রাজ্যের প্রশাসন ও কলকাতা পুরসভার তরফে নাকি একেবারে জরুরি ভিত্তিতে ওই ভ্যাকসিন ল্যাবে পরীক্ষাও হয়ে যায়। পাউডার গোলা জলের তত্ত্ব সামনে আসে। আরও এগোতে গিয়ে আসে বাগড়ি মার্কেটের ওষুধের দোকান থেকে একটি ওষুধের কথা। আরও এগোতে গিয়ে আসে ভুয়ো লেবেলের কথা, একটু বেশি এগিয়ে পুরসভার হলোগ্রাম থেকে সমান্তরাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। নকল অফিসের কথা না হয় বাদ দেওয়াই গেল। করোনা মহামারীকে কেন্দ্র করে এই ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডকে ধামা চাপা দিতে বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সে কী রিপোর্ট দেবে, আর কবেই-বা দেবে, সে কথা স্বয়ং ঈশ্বর জানেন।

পুলিশের একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে যে, কম পক্ষে শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ও রূপান্তরকামী ২৫০ জন মানুষ এই নায়কের দেওয়া ভুয়ো ভ্যাকসিন নিয়েছেন, অন্যদিকে শহরের নানা প্রান্তে ৫০০-র অধিক সাধারণ মানুষও নিয়েছেন ভুয়ো ভ্যাকসিন। এই সব মানুষগুলোর দায় কে নেবেন?

দেখা গেছে, অ্যামিক্যাসিন সালফেটের ৫০০ এমজির একটি ভ্যাকসিনের ছোট্ট শিশির গায়ে কোভিশিল্ড লেবেল সাটা হয়েছে। ভাবা যায়! এই ওষুধটি সম্পর্কে চিকিৎসকরা বলছেন হাড়, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট-এ ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন, এর সঙ্গে হার্ট, লাংস্, এমনকী মস্তিষ্কের ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আদতে এটি একটি অ্যান্টি বায়োটিক। কলকাতা পুরসভার তরফে এই বিষয়টিকে সংবাদ সংস্থার কাছে জানিয়েছেন প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যরাও।

ভাবুন, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চালিয়ে গেল এক প্রতারক, তাও কিনা সরকারি দপ্তরের ভুয়ো পরিচয়ে, সেটা নাকের ডগায় থাকা পুলিশ বা প্রশাসন জানতে পারল না, চিন্তেই পারল না। এর দায় কি এড়াতে পারেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী? ◻

ভুয়ো ভ্যাকসিন নিচ্ছেন সাংসদ মিমি চক্রবর্তী।

কুকুরের বুদ্ধি

কুকুরের বুদ্ধি

বারাণসী রাজ্যের রাজা তখন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব সেসময় কুকুর রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বহু কুকুরের সঙ্গে বোধিসত্ত্ব শ্মশানে বাস করতেন।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত একদিন সুসজ্জিত রথে নগর ভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন। সারথিকে তিনি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন রথের সাজ খুলে রাখতে। সাজ সমেত রথ পড়ে রইল বাগানের পাশে।

সেদিন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় চামড়ার সব সাজ জলে ভিজে গেল। মহারাজের পোষা কুকুরগুলো সেই ভিজে চামড়া খেয়ে ফেলল। পরদিন সকালে রাজার এক ভৃত্য হঠাৎ খেয়াল করল রথের সাজটাজ কিছুই নেই। সে দেখেই বুঝত পারল এসব কুকুরের কাজ। ভৃত্যটি তাড়াতাড়ি রাজাকে গিয়ে বলল মহারাজ, বাইরের কোনো কুকুর ঢুকে আপনার রথের সাজ খেয়ে ফেলেছে।

এই রথটি রাজার খুব প্রিয় ছিল। তিনি খুব রেগে গিয়ে রাজ্যের সব কুকুর মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। মহারাজের আদেশ অমান্য করার নয়। রাজার সেনাবাহিনী কুকুর মারতে শুরু করল। ভয়ে একদল কুকুর শ্মশানে গিয়ে আশ্রয় নিল। কুকরদের দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, ভাই, তোমরা হঠাৎ শ্মশানে কেন? কুকুরদের মধ্যে একটি বোধিসত্ত্বকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। বোধিসত্ত্ব সব শুনে বুঝতে পারলেন এ কাজ বাইরের কোনো কুকুরের নয়। রাজার পোষা কুকুরেরাই এটা করেছে। আর বিনা কারণে বাইরের কুকুরেরা মারা পড়ছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন এর একটা বিহিত করতেই হবে। যেভাবেই হোক নিজের জাতভাইদের বাঁচাতে হবে। বোধিসত্ত্ব কুকুরদের বললেন, আমি বাইরে যাচ্ছি, যতক্ষণ না ফিরছি, ততক্ষণ তোমরা শ্মশান ছেড়ে কোথাও বেরিও না।

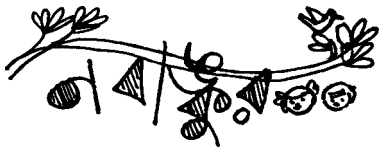

বোধিসত্ত্ব চলে গেলেন ব্রহ্মদত্তের রাজদরবারের দিকে। ভগবানের নাম জপতে জপতে সকলের চোখ এড়িয়ে রাজার সিংহাসনের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। একজন রাজকর্মচারীর হঠাৎ নজরে পড়ল কুকুররূপী বোধিসত্ত্বের ওপর। কর্মচারীটি তাঁকে মারার জন্য উদ্যত হলো। রাজা ব্রহ্মদত্ত তাকে নিষেধ করলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজার সামনে এসে রাজাকে অভিবাদন করে বললেন, মহারাজ, আপনি রাজ্যের সব কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন কেন? রাজা বললেন, ওরা আমার প্রিয় রথের সব সাজ খেয়ে ফেলেছে। তাই সমস্ত কুকুর নিধন করা হবে। বোধিসত্ত্ব বললেন, আপনি কি জানেন কোন কুকুর আপনার রথের সাজ খেয়ে ফেলেছে? রাজা বললেন, সঠিক ভাবে জানি না এটা কোনো কুকুরের কাজ। তাই সব কুকুর মেরে ফেলার আদেশ দিয়েছি। কুকুররূপী বোধিসত্ত্ব বললেন, সঠিক ভাবে না জেনে সব কুকুর মেরে ফেলা কি ঠিক? রাজা বললেন, রাজবাড়ির কুকুরগুলি একাজ করতেই পারে না। তাই রাজবাড়ির কুকুর ছাড়া সব কুকুর মেরে ফেলা হবে। বোধিসত্ত্ব বললন, আমি যদি বলি রাজবাড়ির কুকুররাই আপনার রথের সাজ খেয়ে ফেলেছে। রাজা বললেন, তুমি কি কোনো প্রমাণ দিতে পারবে? কুকুররূপী বোধিসত্ত্ব একটু চিন্তা করে বললেন, অবশ্যই পারি। আপনি দয়া করে একটু ঘোল আর কুশ আনার ব্যবস্থা করুন।

রাজার আদেশ একজন কর্মচারী ঘোল ও কুশ নিয়ে এল। বোধিসত্ত্বের কথামতো ঘোল ও কুশ মিশিয়ে রাজবাড়ির কুকুরগুলিকে খাওয়াতেই তারা বমি করে ফেলল। বমির সঙ্গে রথের সাজের চামড়ার টুকরোগুলো বেরিয়ে এল। সবাই বোধিসত্ত্বরূপী কুকুরের প্রশংসা করতে লাগল। নিজের ভুল বুঝতে পারলেন রাজা। বোধিসত্ত্বের বুদ্ধির জন্য বেঁচে গেল রাজ্যের সব কুকুর।

সংগৃহীত

ভারতের বিপ্লবী

অতুল সেন

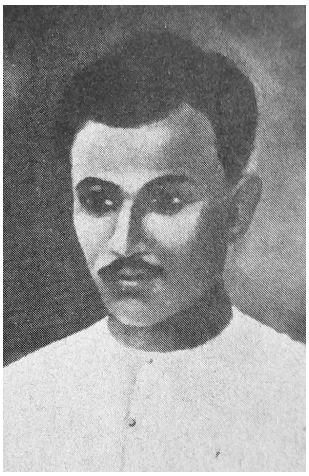

ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অতুল সেন। ছাত্রাবস্থায় প্রখ্যাত বিপ্লবী রসিকলাল দাস, অনুজাচরণ সেন, রতিকান্ত দত্ত, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় স্টেটসম্যান পত্রিকা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে এমন প্রচার করছিল যে তার প্রতিবিধান ও প্রতিকারের নিমিত্ত বিপ্লবীরা পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসনকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। এই গুরু দায়িত্ব পালনের ভার পড়ে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র ও যুগান্তর দলের কর্মী অতুল সেনের ওপর। ওয়াটসনকে হত্যায় ব্যর্থ হয়ে ধরা পড়ার মুহূর্তে তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে ১৯৩২ সালের ৫ আগস্ট আত্মহননের পথ বেছে নেন।

জানো কি?

- অর্কিডের শহর– কার্শিয়াং
- গোলাপি শহর--জয়পুর
- মশলা বাগান– কেরল
- দুধের বালতি-- হরিয়ানা
- গুহার দেশ– সিকিম
- সংগীত শহর-- লখনউ
- আমের শহর– মালদা
- চামড়ার শহর– কানপুর
- ডিমের ঝুড়ি– অন্ধ্রপ্রদেশ
- শ্বেত শহর–উদয়পুর
- নীল শহর– যোধপুর
- হিরের শহর– সুরাট ● লঙ্কার শহর-- গুন্টুর ● সপ্ত দ্বীপের শহর– মুম্বই।

ভালো কথা

এই লকডাউনে প্রতিদিন দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে বাবা আমাকে ও ভাইকে ফোনে কার্টুন দেখাত। কিছুদিন পরে বাবা ভাবল যে তাদের ছোটোবেলার সিনেমাগুলি দেখাবে।

'কাবুলিওয়ালা' সিনেমাটিতে রহমত ব্যবসার জন্যে আফগানিস্তান থেকে কলকাতায় পেস্তা-বাদাম-কাজু-কিসমিস বিক্রি করতে আসত কলকাতায়। রহমত তার মেয়ে রাবেয়ার মতো একটি মেয়েকে দেখতে পায়। তার নাম মিনি। রহমত মিনিকে তার মেয়ের মতো ভালোবাসতে লাগল। তাকে বিনামূল্যে পেস্তা-বাদাম দিতে লাগল। কাবুলিওয়ালা যে তার মেয়েকে এত ভালোবাসত যে সে বাইরে গিয়েও তাকে ভুলতে পারেনি।

'হিরে-মাণিক' সিনেমাটিতে হিরে ও মাণিক বলে দুটি ভাই ছিল। তাদের মা-বাবা দুর্ঘটনায় মারা গেছিল। তাদের জ্যেঠু তাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য বলেছেন যে তাদের মা-বাবা চাঁদের পাহাড়ে আছে। তারা তাদের মা-বাবা চাঁদের পাহাড়ে আছে। কিন্তু মাঝপথে তারা এক ভালো দম্পতিকে পেল যারা তাদের ছেলেকে হারিয়েছে। সেই দম্পতি হিরে-মাণিককে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতে লাগল এবং হিরে-মাণিকও তাদেরকে মা-বাবার মতো ভালোবাসতে লাগল। এই দুটো সিনেমা আমার খুব ভালো লেগেছে।

অরাত্রিকা মিশ্র, পঞ্চম শ্রেণী, জিলা পাবলিক স্কুল, তমলুক।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

ইয়াসের রোষে

শ্রেয়া গোস্বামী, ৮ম শ্রেণী, মাঝড়া, গাজোল, মালদহ।

বাঁধভাঙা জলে মাটি দেখা ভার
ইয়াসের রোষে সবই ছারখার।
গ্রাম ভাসে জলে, বাড়িঘর ছাড়ি
দলে দলে দিল সবে লোকালয়ে পাড়ি।
বাড়িঘর সবই শেষ, পিচপিচে কাদা
ইয়াসের নোনা জলে জমিজমা সাদা।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

অলিম্পিক কি হবে?

নিলয় সামন্ত

প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে আসন্ন টোকিয়ো অলিম্পিক্সে অংশ নিতে চলেছেন মানা পটেল। ২১ বছরের এই সাঁতারুকে 'ইউনিভার্সিটি কোটা' থেকে অলিম্পিক্সে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে ভারতীয় সাঁতার সংস্থা। তিনি ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক বিভাগে নামবেন। ভারতীয় দলের তৃতীয় সদস্য হিসেবে জাপান উড়ে যাবেন আমদাবাদের এই তরুণী। মানা বলেছেন, 'খবরটা পাওয়ার পর থেকে যেন ঘোরের মধ্যে আছি। দেশ-বিদেশের কত ক্রীড়াবিদকে অলিম্পিক্সে অংশ নিতে দেখেছি। এবার বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগিতায় আমার নামও লেখা থাকবে। সেরা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ পাব, এটা ভেবেই দারুণ অনুভূতি হচ্ছে।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপানে অলিম্পিক হবে কিনা তা নিয়ে এখন সংশয় রয়েই গিয়েছে।

এরই মধ্যে আবার জাপান সরকারের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন (আইওএ)। কারণ অলিম্পিক্সে অংশ নিতে চলা ভারতীয় অ্যাথলিট ও কর্তাদের জন্য আলাদা করে কিছু কড়া নিয়ম জারি করেছে জাপান। ভারতে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের পর এই পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। এর ফলে পিভি সিন্ধু, মেরি কমদের প্রস্তুতি বিরাট ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন আইওএ কর্তারা।

জাপান সরকারের নতুন নির্দেশে বলা হয়েছে, ভারত ছাড়ার সাত দিন আগে থেকে প্রত্যেক অ্যাথলিট, কোচ ও কর্মকর্তাকে

রোজ কোভিড পরীক্ষা করাতে হবে। জাপানে পৌঁছনোর পর ভারতীয় দলের কেউ বিদেশি কারও সঙ্গে তিন দিন দেখা করতে পারবেন না। মোট ১১টি দেশ, যেখানে করোনা ভাইরাসের নতুন ধরনের খোঁজ পাওয়া গেছে, তাদের জন্য এই ফতোয়া জারি করেছে জাপান সরকার। করোনার প্রভাব বেশি, এরকম দেশগুলিকে জাপান সরকার কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেছে। ভারত প্রথম গ্রুপে রয়েছে।

আইওএ সভাপতি নরিন্দর বাত্রা এবং সচিব রাজীব মেহতা একটি বিবৃতি জারি করে বলেছেন, 'ইভেন্টের মাত্র পাঁচদিন আগে অ্যাথলিটদের গেমস ভিলেজে ঢুকতে দেওয়া হবে। এর ওপর তিনটে দিন পুরো নষ্ট হবে। এই সময়ই তো চূড়ান্ত প্রস্তুতি সরতে হয়। এটা ভারতীয় অ্যাথলিটদের জন্য খুব খারাপ হলো। এই তিন দিন আমাদের অ্যাথলিটদের জন্য খাবার আসবে কোথা থেকে? যদি প্রত্যেকের ঘরের বাইরে খাবার দিয়েও যাওয়া হয়, কোন খেলোয়াড়ের কী খাবার দরকার, সেটা কে ঠিক করবে? যেখানে প্রত্যেকে কোভিডের টিকা নিয়ে ভারত ছাড়বে, তার সাত দিন আগে থেকে রোজ সবার কোভিড পরীক্ষা হবে, সেখানে নিয়মের বাড়তি কড়াকড়ির কোনও দরকার ছিল কি? বিশেষ করে যখন অ্যাথলিটদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারার সময়, তখন আমাদের খেলোয়াড়রা কিছুই করতে পারবে না। এটা ভারতীয় অ্যাথলিটদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।'

তবে, ভারতীয়দের জন্য তাঁরা এই নীতি প্রয়োগ করলেও খোদ জাপানে কিন্তু এখনও করোনার প্রকোপ কমেনি। এদিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে অলিম্পিক্সও। তাই রাতের দিকে বা বড়ো ইভেন্টে দর্শকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার ভাবনাচিন্তা চলছে।

চিবা ও সাইতামার গভর্নররা এর মধ্যেই আয়োজকদের অনুরোধ করেছেন যাতে তাঁদের এলাকায় রাতের দিকের কোনও ইভেন্টে দর্শক প্রবেশের অনুমতি না দেওয়া হয়। এই অনুরোধের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে পাঁচ সদস্যের কমিটি, যেখানে রয়েছেন টোকিয়োর গভর্নর, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রধান, টোকিয়ো অলিম্পিক্স কমিটির আয়োজকদের প্রধান এবং অলিম্পিক্সের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রী তামায়ো মারুকাওয়া। টোকিয়ো এবং দেশের অন্যান্য কিছু জায়গায় এখনও আপৎকালীন অবস্থা জারি রয়েছে। তা তোলা যায় কি না, তা ঠিক হবে আগামী সপ্তাহে।

এবার অলিম্পিক্সের পদক তৈরি হচ্ছে ফেলে দেওয়া ল্যাপটপ ও স্মার্টফোন দিয়ে। এই যন্ত্রাংশগুলিকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্য করে তুলে তা দিয়ে পদক তৈরি হচ্ছে। অতীতে গাড়ির যন্ত্রাংশ, বাতিল হওয়া যন্ত্র, লোহা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল পদক।

বাঙ্গালি মেয়ের চুপকথার কাহিনি

ড. অঞ্জনা পায়ড়া

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদের দুই মহাকাব্য আবর্তিত হয়েছে দুই নারী চরিত্র সীতা ও দ্রৌপদীকে নিয়ে। সংযুক্তাকে কেন্দ্র করে জয়চাঁদ মহম্মদ ঘোরিকে না আনলে ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হতো। পদ্মাবতীর ইতিহাস, এখনো ভারতবর্ষকে যুদ্ধের মাত্রা দেয়।

মধ্যযুগের ইতিহাসে আমরা কেবল বিজেতাদের হিন্দু নারীর প্রতি কাম লোলুপতা দেখেছি। যুগ যুগ ধরে লোলুপতার শিকার মেয়েরা। দশ হাজার বেগমের হারেম, 'সুশাসক' আকবরের লালসার নজির।

এতদিন মহিলারাই ভারতে মানব সভ্যতাকে জল ও জ্বালানির জোগান দিয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বেদের যুগে নারীর সমানাধিকার ছিল। মধ্যযুগে মেয়েরা শিক্ষা, অর্থনীতি থেকে দূরে থেকে শ্রম ও বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। তবু প্রাচীন ভারতে ম্লেচ্ছদের কামানল থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে 'জহর' ব্রত পালন করেছে মহিলারা। এখনো প্রতিদিনের সংসার যুদ্ধে দু'হাতে আগলে রাখে সবাইকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে সেবার কাজ। মূল্যের বিচারে অমূল্য, তাইতো মূল্যহীন।

চৌত্রিশ বছরের বাম জমানায় নারীর সমানাধিকার চেতনা, আলোহীন বাকচাতুর্যের কুটতর্কেই বিলীন। আর গত দশ বছর মূল্যবোধহীন, নৈতিকতাহীন সেই মধ্যযুগের অন্ধকার যেন পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে। কখনো গণধর্ষণ, কখনো লাভজিহাদ নয়তো অ্যাসিড হামলা বা পাচার। কাজ দেওয়ার অছিলায় চালান হয়ে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে বা ভারতের বাইরের কোনো দেশে।

পরিস্থিতি দেশভাগের স্মৃতিকে জাগিয়ে তোলে। দেশভাগের সময় হিন্দু নারীদের ওপর অত্যাচারের ইতিহাসে কলঙ্ক হয়ে থাকবে মানব সভ্যতায়। বাস্তবে এখনো সর্বস্তরে নারী শিক্ষা, তার ক্ষমতায়ন কেবল প্রহসনই থেকে গেছে পশ্চিমবঙ্গে। অথচ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা, নারীশিক্ষা আলোকিত করেছিল বাঙ্গলাকে।

কিন্তু ২০২১-এর বিধানসভার ভোটের ফল ঘোষণার পর ক্রমাগত হিংসায় কাঁপিয়ে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। প্রতিদিনের শাসকদলের অত্যাচার, হিংসা স্তম্ভিত করেছে সারা পৃথিবীকে। জয়ের উল্লাস, মহিলাদের প্রতি আক্রমণ, রক্তাক্ত করেছে বাঙ্গালিকে। এ যেন হিন্দু রমণীর অভিশাপ। বাঙ্গলার নারীকে না পেরেছে সম্মান দিতে, না পেরেছে সুরক্ষা দিতে।

পুরুষরা বাড়িছাড়া, গ্রামছাড়া দূরে কোথাও। শিশু, বয়স্ক, গবাদি পশু আগলে মহিলারা। রক্তলোলুপ নেকড়েরা গ্রামে, শহরে, পাড়ায় পাড়ায় দল বেঁধে বোমা বন্ধুক নিয়ে অসহায় নিরস্ত্র, নিরীহ মানুষদের ওপর হায়নার মতো দিনের পর দিন অত্যাচার করছে। সংসারে সর্বস্ব লুঠ করে, মেরে, রক্তাক্ত করে শারীরিক হেনস্থা করে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে ধর্ষণ, পরিজনদের শেষ করে দেওয়ার হুমকি। মায়ের সামনে মেয়েকে ধর্ষণ, পুলিশকে দিয়ে 'কিছু হয়নি' লিখিয়ে নিয়ে denial violence করেই যাচ্ছে।

অধিকাংশ মহিলার কাছে ফোন নেই বা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বাড়িতে সক্ষম পুরুষ মানুষ নেই। চিকিৎসা নেই, খাবার নেই। অন্যদিকে কোভিড আছে, মৃত্যু আছে। কিন্তু গবাদি পশু ও শিশুদের নিয়ে কোথায় যাবে তারা। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জল্লাদরা। ধ্বংসস্তূপে প্রহর গোনা— এ কোন অরাজক রাজ্য!

শহরে আর এক চিত্র। ঘরছাড়া মহিলারা দুধের শিশু, খাবার নেই। পরিজনদের খবর নেই, ফেরার নিশ্চয়তা নেই। যারা ফিরেছে, শাস্তি, জরিমানা আর দাসখত। আপাদমস্তক চেয়ে চেয়ে চোখের শাসানি, বাইক বাহিনীর টহল, দল বেধে হুমকি। মামলা করা যাবে না, তাহলে তো ডবল হয়রানি। কেস তুলতে হবে, নয়তো মার আর জরিমানা। কাগজে লিখতে হচ্ছে শাসকদল ছাড়া অন্য কিছু করা যাবে না। তবু বামেরা এই 'গণতন্ত্র'কেই সমর্থন করে। ওরা জিতেছে, তাই যা কিছু করতে পারে।

আইনের চোখে ঠুলি! কারণ আমরা জানি criminal case-এ প্রয়োজন Standard of proof। আইনের ফাঁকেই আইন আটকে। অবশ্যই criminal Law তে বলা হয় 'beyond resonable doubt' কথাটি। তাই এরা আইনের সাহায্য পাবে না, চায়ও না। খেটে খাওয়া মানুষগুলো প্রতিদিন কোর্টে যাবে কী করে, পয়সাই বা পাবে কোথায়। ঝামেলায় কেউ জড়াতেও চায় না।

যে সব শিশু violence প্রত্যক্ষ করে, যে সব মহিলাদের ওপর violence হয়, যেহেতু শাসকদল স্বীকারই করে না, তাই After violence তাদের জন্য যা প্রয়োজন, counseling, legal aids, temporary shelter– কোনো কিছুরই ব্যবস্থা হয় না। বাঙ্গালি নিজের মেয়েকে পেয়েছে। তাইতো নিজের মেয়ে রোহিঙ্গাদের চায়। এই মায়েরা বহিরাগত কারণ এদের violence ছবিগুলোকে আমদানিকৃত তকমা দেওয়া হচ্ছে।

তাই বাঙ্গলার মহিলা ক্ষমতায়ন সেই অন্ধকারেই। Domestic violence এ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান নিয়েই আছে, নীল সাইকেল, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট। হয়তো আবার আমাদের সরতে হবে ঝাড়খন্ড, বিহার বা অসমে। বাঙ্গলা জুড়বে বাংলাদেশেই। যে ক্ষতি তা কয়েক প্রজন্মের, দেশের, এবং জাতির।

Secular Hindu বাঙ্গালিদের সহাবস্থান, জেহাদিদের চোখে দেশের চেয়ে ধর্ম বড়ো, আর বামেদের কাছে দেশের চেয়ে দল বড়ো, আমরা রাষ্ট্রবাদীরা রক্তাক্ত লড়াইয়ে আরও রক্তক্ষরণে বলবো—

'চিত্ত যেথা ভয়শুন্য
উচ্চ যেথা শির'

ধর্মান্তরকরণে পাকিস্তানের কালো ছায়া এখন ভারতবর্ষেও

রঞ্জন কুমার দে

সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে প্রায়ই ফুটে ওঠে পার্শ্ববর্তী দেশ পাকিস্তানের সংখ্যালঘু কন্যাদের ধর্মান্তরকরণের করুণ চিত্র ও বৃদ্ধ পিতা-মাতার নিষ্ফল আবেদন। দুষ্কৃতকারীরা নিশ্চিত আন্দাজ করে নিয়েছে যে দেশের প্রচলিত আইন এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের আশীর্বাদে অবশ্যই তাহারা নিরাপদ ও সফল। সেই ধর্মান্তরকরণের ফর্মূলা খুবই সরল ও ধারাবাহিক। প্রথমে অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তরকরণ এবং বিয়ে– যেখান থেকে কোনো সংখ্যালঘু পরিবারের ধর্মান্তরিত মেয়ের ফিরে আসা খুবই কষ্টসাধ্য। পাকিস্তানের মানবাধিকার কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ২০০৪ সালের জানুয়রি মাস থেকে ২০১৮ সালের মে পর্যন্ত শুধু সিন্ধুপ্রদেশেই মোট ৭৪৩০ জন সংখ্যালঘু বালিকা, যুবতী ও গৃহবধূকে অপহরণ করে ধর্মান্তরিত করা হয়। রেনো কুমারী, চান্দি কোহলি, পাঠানি ভিল, নাজো কোহলি, পারোয়াতি কোহলি, রীনা মেঘওয়ার, রিঙ্কল কুমারী-সহ অসংখ্য হতভাগী এই জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণের শিকার। পাকিস্তানের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণরোধে নন্দকুমার নামে সিন্ধুপ্রদেশের এক সেনেট সদস্য একটি বিল পেশ করেছিলেন কিন্তু গভর্নর সাইদুজ্জামান সিদ্দিকি বিলটি ইসলামের পরিপন্থী বলে বাতিল করে দেন। একইভাবে পাকিস্তানের এক খ্রিস্টান সাংসদ ড. নবিদ আমির জিবা সংবিধানের ৪১ ও ৯১নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দেশের অ-মুসলমানদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির হওয়ার পথ প্রশস্ত করতে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু রাজ্যমন্ত্রী আলি মোহাম্মদ-সহ বাকি সদস্য একই কারণে অসম্মতি প্রকাশ করলে প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়। ধর্মীয় সংখ্যালঘু বিদ্বেষে পাকিস্তানে ২০১৭ সালের জনগণনায় শিখদের সংখ্যা কমে ৮০০০ হয়েছে যেটি ২০০২ সাল পর্যন্ত ৪০০০০ ছিল। ২০১৯-এর জানুয়ারি মাসে সিন্ধুপ্রদেশের রাজকুমারী তালরেজাকে গুলি করে হত্যা করা হয়, কারণ সে ধর্মান্তরকরণ ও বিয়ে উভয়টিতে অসম্মত ছিল। তবে একই বছরের ৬ ফেব্রুয়ারি ১৩ বছরের খ্রিস্টান নাবালিকা সাদাফ এবং ২৪ মার্চ সোনিয়া ভিলকে ধর্মান্তরিত করে বিয়ে করতে তেমন অসুবিধা হয়নি।

পাকিস্তানের ধর্মান্তরকরণের কালো ছায়া এখন ভারতেও। গেরুয়াপন্থীরা অনেক আগে থেকে তথাকথিত ধর্ম পরিবর্তন বা লাভ জেহাদের অভিযোগ করে আসছিল। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ পুলিশ ধর্ম পরিবর্তনকারী একটি গ্যাঙের সন্ধান পেয়েছে যার মুখ্য আসামি ওমর গৌতম ও জাহাঙ্গির কাসমি। ২০১০ সাল থেকেই এই গ্যাং দিল্লির জামিয়া নগরে 'ইসলামিক দাওয়া সেন্টার' নামে এক আস্তানায় বোবা, বধির, অসহায় লোকদের সাহায্যের নামে ব্রেনওয়াশ করে প্রায় কয়েক হাজার লোককে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে আসছিল। তাদের এই দাওয়া সেন্টারে ২০১৮ সালে মেমচন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করে মোহাম্মদ আনাস বানিয়ে তাকে ২০১৯ সালে হজ পালনে মক্কায় পাঠানো হয়। তারপর পাকিস্তানে সন্ত্রাস-ট্রেনিং এবং কাশ্মীরে পাথরবাজিতে তাকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএস এই দাওয়া সেন্টার থেকে ১৬০টি ধর্মান্তরকরণের সার্টিফিকেট উদ্ধার করে, মূলত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে চলা মূক-বধিরদের স্কুলগুলি টার্গেট করাই ওমর গৌতমদের মুখ্য উদ্দেশ্যে ছিল। মূক-বধিররা যেহেতু বলতে-শুনতে পায় না, তাই সামান্য সহানুভূতিতে খুব সহজে তাদের সঙ্গে সাংকেতিক ভাষায় আলাপ আলোচনায় 'দাওয়াত'-এ আমন্ত্রণ জানানো যেত। ভারতের সংবিধানের ২৫-২৮নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্বাধীনভাবে ধর্মপালন ও প্রচারের বিধান রয়েছে। স্বেচ্ছায় যে কেউ তাদের ধর্ম বেছে নিতে পারে কিন্তু লোভ লালসা, ছলনা কিংবা ভয়ের মাধ্যমে

কোনো রাজ্যের আইনই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরকরণে হস্তক্ষেপ করে না, তবে সেটা যদি জবরদস্তি, লোভ কিংবা প্রতারণার দ্বারা হয় তা নিঃসন্দেহে বেআইনি এবং বিচারাধীন।

কাউকে ধর্মান্তরকরণ নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ।

ইদানীং শিখ সম্প্রদায়ের দুই যুবতী দনমিত ও মনমিত কৌরের অপহরণ ও ধর্মান্তরকরণে কাশ্মীর ঘাঁটি উত্তাল। অকালি শিরোমণি-সহ বাকি শিখ সংগঠন রাজ্যপাল

গৃহমন্ত্রীর কাছে কঠোর পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে। ধর্মান্তরকরণের অপরাধে আগ্রা পুলিশ কাশিম কুরেশি ও তার বোন শবনমকে গ্রেপ্তার করে। উক্ত অপরাধী নিজেদের ভিকি যাদব ও সোনম পরিচয় দিয়ে এক নাবালিকা (১৬) হিন্দু মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে এবং ধর্মান্তরকরণ করে। পরে তাদের আসল পরিচয় প্রকাশ পেলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। ধর্মান্তরকরণের অপরাধে গুজরাটেও 'Gujrat Freedom of Religion (Amendment) 2021'-এর আওতায় মুহিব পাঠান, ইমতিয়াজ পাঠান ও মহসিন পাঠানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরকম অনেক ধর্মান্তরকরণের ঘটনা রয়েছে যেগুলো প্রকাশ্যে আসতে পেরেছে, অনেক আসেনি, অনেকগুলোর অভিযোগ দায়ের হলেও সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে খারিজ হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের জাতীয় সংসদে জবরদস্তি ধর্মান্তরকরণ রোধে ১৯৫৪ সাল, ১৯৬০ সাল ও ১৯৭৯ সালে বিভিন্ন খসড়া ও বিল উত্থাপিত হয়, কিন্তু রাজনৈতিক মারপ্যাঁচে কেন্দ্র সরকার এই সংক্রান্ত কোনো বিলই কার্যকর করতে পারেনি। তাই ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রণালয় ধর্মান্তরকরণকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার এখতিয়ারের বিষয় বলে নিজেদের দায় সেরে নেয়। ধর্মীয় স্বাধীনতার আইন বর্তমানে ৮টি রাজ্যে কার্যকরী রয়েছে— ওড়িশা (১৯৬৭), মধ্যপ্রদেশ (১৯৬৮), অরুণাচল প্রদেশ (১৯৭৮), ছত্তিশগড় (২০০০ ও২০০৬), গুজরাট (২০০৩), হিমাচল প্রদেশ (২০০৬ ও ২০১৯), ঝাড়খণ্ড (২০১৭) এবং উত্তরাখণ্ড (২০১৮)। ধর্মান্তরকরণ সংক্রান্ত এই বিল তামিলনাড়ুতে ২০০২ সালে এবং রাজস্থানে ২০০৮ সালে পেশ হয়েছিল। কিন্তু ২০০৬ সালে তামিলনাড়ুতে সংখ্যালঘু খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের আপত্তিতে বিলটি খারিজ হয়ে যায় । রাজস্থানে গভর্নর ও রাষ্ট্রপতির অসম্মতিতে বিলটি সেখানেও পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। অরুণাচল ও হিমাচল প্রদেশে ধর্মান্তরকরণ সংক্রান্ত মামলায় সংশ্লিষ্ট পূজারি/যাজক বা মৌলভিকে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট বা সমপর্যায়ের অমলাকে অন্তত ৩০ দিন আগে লিখিতভাবে অবগত করাতে হবে। উত্তরাখণ্ডেও ধর্মান্তরিত হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি এবং সংশ্লিষ্ট ধর্মগুরু উভয়কে অন্তত ১ মাসের অগ্রিম নোটিশ জেলাস্তরে তথ্য পেশ করতে হবে। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে ধর্মান্তরকরণ মামলায় সেকশান-৪-এর আওতায় খোদ পীড়িত/পীড়িতা বা তাদের অভিভাবক মা-বাবা, ভাই-বোনের লিখিত অভিযোগেই মামলা নেওয়া যেতে পারে এবং সাব-ইন্সপেক্টরের নীচের ব্যাঙ্কের কোনো অফিসার সেই মামলা তদন্ত করতে পারবেন না। হিমাচল প্রদেশে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের নীচের কেউ সেই তদন্ত করতে পারে না। মধ্যপ্রদেশে ধর্মান্তরকরণ সংক্রান্ত নতুন আইন অনুচ্ছেদ (৯এ) শিশু ও মহিলাদের সুরক্ষায় বেআইনি ধর্মান্তরকরণে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। এই প্রদেশে ধর্মান্তরকরণে দোষী সাব্যস্ত হলে অভিযুক্ত ১ থেকে ৫ বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়। তবে ভুক্তভোগী তফশিলি বা উপজাতি সম্প্রদায়ের হলে সাজা বেড়ে ১০ বছর পর্যন্ত হয়। উত্তরপ্রদেশে ন্যূনতম সেই সাজা ১ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত রয়েছে, তবে অপরাধ পুনরায় হলে সাজার বিধান দ্বিগুণ রাখা হয়েছে। হিমাচল ও অরুণাচল প্রদেশে কংগ্রেস শাসিত সরকার এবং বাকি রাজ্যগুলোতে বিজেপি শাসিত সরকারে ধর্মান্তরকরণ বিলকে আইনি মর্যাদায় অবশ্যই প্রমাণ করেছে যে, জাতীয় বৃহৎ স্বার্থে আদর্শ ভিন্ন হতে পারে না।

বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ।

উল্লেখ্য, কোনো রাজ্যের আইনই স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরকরণে হস্তক্ষেপ করে না, তবে সেটা যদি জবরদস্তি, লোভ কিংবা প্রতারণার দ্বারা হয় তা নিঃসন্দেহে বেআইনি এবং বিচারাধীন। মাদার টেরেসার নির্মল হৃদয়-সহ বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা ভারতের বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া তফশিলি জাতি-উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণের জাল বিস্তার করে আসছিল। ইসলামি ধর্মগুরু ও প্রচারক জাকির নায়েককে কেন্দ্র সরকার ধর্মান্তরকরণ এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসাজোস থাকায় অনেক আগেই তদন্তের আওতাধীন করেছে। যাই হোক, ভারতবর্ষে ধর্মান্তরকরণের জাল সুদূর বিস্তৃত যেটা এখন আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফটিত হচ্ছে, সুতরাং অতি শীঘ্রই ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে কঠোর বিল পাশ করে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে আইন করা হোক।

রাষ্ট্রবোধ পিষে ফেলতে আয়োজিত এক সংগঠিত সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন নির্বাচন পরবর্তী হিংসা

কল্যাণ গৌতম

স্বামী প্রণবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল 'মহামৃত্যু কী?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'আত্মবিস্মৃতি।' নিজেকে ভুলে যাওয়া, নিজের পূর্ব ইতিহাস ভুলে যাওয়া; নিজের পরিবার, গোষ্ঠী, ধর্মের প্রতি নেমে আসা অসংখ্য আক্রমণের ধারাবাহিকতা ভুলে যাওয়ার নামই হলো আত্মবিস্মৃতি'। বাঙ্গালি হিন্দু এক চরম আত্মবিস্মৃত জাত। তারা সহজেই তার উপর নেমে আসা প্রভূত প্রহার ভুলে যায়; অপরিমিত অন্যায়-অত্যাচার বিস্মৃত হয়। ভুলে যায় বলেই তাদের ক্রমাগত পালিয়ে বাঁচতে হয় 'পুব থেকে পশ্চিমে', আরও পশ্চিমে। দৌড় দৌড় দৌড়! জীবন হাতে করে পাশবিক পঙ্কিল পরিবেশে বাঁধা মুক্তির দৌড়! জলছবিটির মতো গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনের সন্ধানে নিজের ধর্ম নিয়ে দৌড়! মা-বোন-বউ-মেয়েকে মাংস হাতড়ানো ভয়ংকর পশুর মুখে ফেলে রেখেই নিজের জীবন বাঁচানোর দৌড়! এই আত্মবিস্মৃতি থেকে বাঙ্গালি তখনই রেহাই পাবে, যখন যাবতীয় জীবনের জিঘাংসার সালতামামি ভুলতে দেবে না! সম্প্রীতির আলিঙ্গন নিয়ে বাস করেও প্রতিবেশীর আক্রমণের সহিংসতার ইতিহাস মনে রাখবে! বাঙ্গালি হিন্দু টিকে থাকবে কিনা, তার পরীক্ষা তখনই শুরু হবে।

গত মে মাসের গোড়ায় নির্বাচন-পরবর্তী যে মহাতাণ্ডব সারা বাঙ্গলা জুড়ে সর্বসমক্ষে 'নিঃশব্দে' অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কয়েক বছর ধরে সারা বাঙ্গলায় ইতিউতি উন্মত্ততার যে ভয়ংকর কদর্য-কর্মের রূপ তার পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছিল, তা মোটেই সাদামাটা এক রাজনৈতিক সংঘাত ছিল না। একে দুই রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার লড়াই মনে করলে ভুল হবে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মোড়কের মধ্যে এক আগ্রাসী সম্প্রদায়ের সংগঠিত হত্যালীলা, সাম্প্রদায়িক রোষ। ফলপ্রকাশের পর পশ্চিমবঙ্গ আড়েবহরে এক সাম্প্রদায়িক কসাইখানায় পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্রবাদ, সঙ্ঘ-বিচারধারাকে বাঙ্গলার মাটি থেকে চিরতরে মুছে দিতে বধ্যভূমি রচনার কাজ চলেছিল। অত্যাচার, লাঞ্ছনা, জুলুম, জরিমানা, ধর্ষণ ও ধ্বংসের করুণ সে কাহিনি, যাকে ওদের ভাষায় বলা চলে 'খেলা'। ঘরভাঙার খেলা, বিরোধী শূন্য করে দেওয়ার খেলা। যে ধরনের খেলা দেখে অভ্যস্ত বাঙ্গালি হিন্দু। নিজের প্রাণ ও ধর্ম বাঁচাতে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি হিন্দু সীমানা পেরিয়ে অশেষ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে ভারতবর্ষে শরণার্থী হয়েছে; অনেকটা সেই ধরনের খেলা, তবে অবশ্যই এটা একটা ট্রায়াল। দেখে নেওয়া বাঙ্গালি হিন্দু যদি এতেও চুপ থাকে, নেমে আসবে আরও গাঢ় সেই অন্ধকার। যা থেকে কোনো সনাতনীর রেহাই পাবার নয়।

মনীষী বিচিত্রায় ও ধারাবাহিকতায় ভেতর থেকে যথার্থ শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সবার আগে হিন্দুর প্রতি সংঘটিত জিঘাংসার দলিল পাতায় পাতায় লিখে যেতে হবে আমাদের।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, বাঙ্গলার মিডিয়ায় তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। ইলেকট্রনিক মিডিয়া একেবারেই নিশ্চুপ। বুদ্ধিজীবীদের মুখে ছিল কুলুপ। প্রতিবাদী কণ্ঠ গর্জে ওঠার রাস্তা নেই। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে খানিক আভাস পাওয়া গিয়েছিল বটে, বাস্তবের পরিস্থিতি ছিল তার চাইতেও ভয়ংকর।

ভোট তো সারা দেশেই হয়, রাজ্যে রাজ্যে হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো সহিংসতা কোথায় হতে দেখেছেন? আপনারা ২০১৮ সালের হত্যালীলার পঞ্চায়েত নির্বাচন সংঘটিত হতে দেখেছেন। কিন্তু রক্তে- শোকে-সন্তাপে তা ২০২১-এ বহুগুণ ছাপিয়ে গেছে। ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা জুড়ে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী এবং রাষ্ট্রবাদী অরাজনৈতিক মানুষের উপর নেমে এলো ভয়ংকর আক্রমণ, কোনো সভ্য দেশে যা কল্পনা করা যায় না। আক্রমণের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্রবাদী বাঙ্গালি হিন্দু। কোন্ বাড়ি ভাঙা হবে, কোন্ নারী ধর্ষিতা হবেন, ধর্ম দেখে দেখে চিনিয়ে দেবার কাজ করেছিল শাসক দালাল প্রতিবেশী হিন্দু। বিধর্মী হার্মাদকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে ব্যাপক ব্যবহার এই প্রথম; যদিও তার সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল বিগত এক দশক ধরে। এই যদি প্রবণতা হয়, আক্রমণকারী কারা তার পরিচয় নেওয়া হয়,

তবে ভবিষ্যতে বাঙ্গলার কোনো রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতা-কর্মীই কিন্তু সুরক্ষিত থাকবেন না। এ এক আগুন নিয়ে খেলা হবে। রবীন্দ্রনাথের কথায় --- 'আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবিনে রে।'

আমরা সমাজের উঁচুনিচু ভেদাভেদ করি না। কিন্তু পরিসংখ্যান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, যারা নিধন হয়েছেন তারা প্রায় সবাই সিডিউল কাস্ট, সিডিউল ট্রাইব, আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির। তারা ব্রাত্যজন, তারা বনবাসী, তারা অন্তেবাসী, প্রান্তবাসী। অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় মানুষের উপরে টার্গেট করেছে এই হিংস্রতা। হিন্দু উচ্চ-নীচ কেউ বাদ পড়েনি। এর কি কোনো বিচারই হবে না? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে? অন্য রাজ্যের মানুষ এই জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে চর্চা করছেন, প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বিচার চেয়েছেন। ভুক্তভোগী ছাড়া, রাজনৈতিক কর্মী সমর্থক ছাড়া বাঙ্গলার সাধারণ মানুষ তা জানতেই পারেননি। আমরা কেন প্রশ্ন করবো না শীতলকুচির ওই এসসি মিন্টু বর্মণ, জগদ্দলের ওই এসসি শোভারানি মণ্ডল, বীনপুরের এসটি কিশোর মাণ্ডি, ডায়মন্ড হারবারের ওবিসি অরিন্দম মিদ্দে—আমার রক্ত, আমার ভাই! এটা রাজনৈতিক চাদরের আড়ালে এক পরিকল্পিত সম্প্রদায়িক জিঘাংসা। একদল হিংস্র মানুষকে দিয়ে অন্য হিন্দুদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনার খেলা। তা লঘু করে দেখলে চলবে না।

অনেকদিন ধরেই আমরা 'ল্যান্ড-জেহাদ', 'লাভ-জেহাদ' ইত্যাদি কথাগুলি শুনে আসছি। সীমান্তবর্তী গ্রামে ক্রমাগত অন্য ধর্মের মানুষের সংঘটিত জোরদারির মুখে শান্তিপ্রিয় শিক্ষিত হিন্দু নিজেদের জমি বসতবাড়ি বিক্রি করতে একরকম বাধ্য হয়। অসতর্ক সেকুলার হিন্দু পরিবারের মেয়েটিকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে তাকে ধর্মান্তরিত করা হয়, অনেকক্ষেত্রেই বিবাহ পরবর্তী জীবন সুখের

স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ।

হয় না। সম্প্রতি সেই সন্ত্রাসের একটি নয়া পদ্ধতি হলো হিন্দু কৃষকের জমি কেড়ে নেওয়া। বাম আমলে ভূমি সংস্কারের নামে অনেক কৃষক জমি চাষ করার সুযোগ লাভ করেছিল কয়েক দশক ধরে। কিন্তু তারা সকলে জমির পাট্টা পাননি। ফলে তাদের জমির স্বত্ব তারা অফিসিয়ালি অধিকারভুক্ত হননি। এই অবস্থায় রাষ্ট্রবাদী শক্তির সঙ্গে থাকা কৃষকের জমি সন্ত্রাসীরা কেড়ে নিচ্ছে। তাদের কাছ থেকে জোর করে টাকা দাবি করছে পুনরায় চাষের অনুমতি লাভের জন্য। এই সমস্যা থেকে বাঁচতে জমিচষা সেই কৃষক তৃণমূল দলে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

এখন এই জোরজবরদস্তির জীবন থেকে মুক্তির পথ কোথায়? পলায়নপর হিন্দু বাঙ্গালির মুক্তি ও শেষ গন্তব্য কোথায়? সে কি তার আপন ধর্ম-সংস্কৃতি বজায় রেখে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিরুপদ্রবে বেঁচেবর্তে থাকতে পারবে না? পারবে। হিন্দুকে বেঁচে থাকতে হলে সংগঠিত হয়েই থাকতে হবে। প্রায় একশো বছর আগেই বলে গিয়েছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা, হিন্দুরক্ষী স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। বলেছিলেন, 'সঙ্ঘশক্তি কলিযুগে'। তিনি সঙ্ঘশক্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কারণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন বিশাল জাতিকে এক ধর্মসূত্রে গেঁথে নেবার প্রয়োজন আছে। তিনি হিন্দুকে মহামিলনে সম্মিলিত করাকে সেবা আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু বাঙ্গালির সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য উত্তরাধিকার। এই কাজে বাঙ্গলার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্বজ্জনের অংশগ্রহণ জরুরি, জরুরি ছাত্র ও যুবশক্তির অংশগ্রহণ, মাতৃশক্তির মহাজাগরণ। এর জন্য প্রত্যেকের মানসিক শক্তি চাই। শরীর সবল ও সুস্থ থাকলেই মানুষ মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হতে পারে। মানুষ ভয় পেলে আর শক্তিহীন হলে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি শুনিয়ে যায়। পেশিতে শক্তি না থাকলে সে অমেরুদণ্ডীর মতো আচরণ করে। তখন দু'-চারশো মানুষের জনশক্তিতে ভরপুর গ্রামেও আট দশজন হিংস্র মানুষের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে না। মনে রাখতে হবে, হিন্দু বাঙ্গালির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে এক দুষ্ট শক্তি, তাতে বাইরের দেশের বৃহত্তর মদত আছে। সেই পশুশক্তি প্রতিবেশীর রূপ ধারণ করে আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে এবং তারা ঐতিহাসিক কারণেই শক্তিমান। স্বামী প্রণবানন্দজীর মতে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি রক্ষা তখনই সম্ভব হবে, যখন উভয়েই শক্তিশালী ও মত প্রকাশে বলিষ্ঠ হবে। আমরা চাই একই বৃন্তে সত্যিকারের দুটি কুসুম ফুটে উঠুক। হিন্দু বলে নিজেরা গর্বিত হবার মধ্যে কোনো পাপ নেই। হিন্দু অস্মিতার মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতা থাকতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলার নবজাগরণ হিন্দু নবজাগরণই ছিল, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রত্যেকেই হিন্দু অস্মিতার এক অনবদ্য মালা।

মনীষী বিচিত্রায় ও ধারাবাহিকতায় ভেতর থেকে যথার্থ শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে তাই আপত্তির কোনো কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু সবার আগে হিন্দুর প্রতি সংঘটিত জিঘাংসার দলিল পাতায় পাতায় লিখে যেতে হবে আমাদের। □

স্বদেশ-অভিমানের যথার্থ মঞ্চ সঙ্ঘ-শাখা

সঙ্ঘ প্রচারবিমুখ, তাই প্রচারের আলোতে না থেকেই রাষ্ট্রনির্মানে ব্রতী। বহু বাধা, বহু বিপত্তি সত্ত্বেও সঙ্ঘ নিজ পথে অটল থেকে শতবর্ষে পদার্পণের পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রতাপাদিত্য গৌতম

''হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা, এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে?'' স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্রের বাণী কীভাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে আশ্চর্যজনকভাবে সমান প্রাসঙ্গিক তা বিশ্লেষণ করা যাক। বহু আঘাত, আক্রমণ, ঝড়-ঝাপটা সামলে আমাদের দেশজননী ভারতমাতা আজও প্রাচীন সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গেই বিরাজমান। আমরা আমাদের জীবনদর্শন, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সামলে কীভাবে কণ্টকময় পথ ও অবসাদ কাটিয়ে ইতিবাচক জীবনচর্যা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি তা এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন মনীষীদের জীবন ও কাজ অধ্যয়ন করলেই ধারণা পাওয়া যায়। আজকের যুবসমাজ বিদেশি দর্শন অনুকরণ করার ফলে ধীরে ধীরে মানসিক ভাবে দুর্বল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের মাতৃভূমি বহুবার আক্রান্ত হয়েছে বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা। তারা প্রথম ধ্বংস করে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষাস্থানগুলি। অসংখ্য পণ্ডিতকে খুন করা হয়। নালন্দা, তক্ষশীলার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে প্রচুর পুঁথি পুড়িয়ে ফেলা হয়। স্বভাবতই পণ্ডিত ও পুঁথি একসাথে পোড়ালে পরবর্তীতে কেউ আর মূল্যবান পুঁথি পুনরুদ্ধার করতে পারবেন না, কারণ তখন যে ছাপাখানা ছিল না। ফলে সহজেই আগামী প্রজন্মকে বিপথগামী করা যাবে। সেই ধারাই চলে আসছে সুলতানি আমল থেকে ব্রিটিশ আমল অবধি। তার পরে আমরা ব্রিটিশদের কেরানি হবার শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করেছি। বিদেশি আচার-বিচার গ্রহণ করেছি। ইংরেজি শিক্ষা নানান জ্ঞান আহরণের জন্য ভালো, কিন্তু সেটাকে পরম সভ্যতা ধরে নেওয়াটাই কাল হয়েছিল। আজকের সমাজ তা হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে। ক্রমাগত চাপ ও বয়সে এই প্রতিযোগিতামূলক প্রতিযোগিতায় যুবসমাজ এক অনিবার্য অবসাদময় জীবনের দিকে চলে যাচ্ছে। বলা যেতে পারে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বিদেশ ক্রমাগত সনাতনী শিক্ষা, আচার ও ব্যবহার রপ্ত করছে, অপরদিকে এই দেবভূমি ভারতবর্ষে কনভেন্ট শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছে, আচার ও বিচারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে এবং যুবসমাজকে অবসাদগ্রস্ত জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। যার ফলস্বরূপ গত কয়েক বছরে আত্মহত্যার ঘটনা বেড়েছে।। অবসাদ যে শুধুই পড়াশুনা থেকে আসে তা নয়, এই প্রতিযোগিতার দুনিয়াতে যে ইঁদুরদৌড় শুরু হয়েছে, তা থেকে নিস্তার কম মানুষই পেয়েছেন। অথচ প্রতিযোগিতা কি নতুন? একেবারেই নয়। প্রতিযোগিতা ছিল বরাবরই, কিন্তু এখনকার প্রতিযোগিতা হল কৃত্রিম, দিশাহীন। ভালো-খারাপ বিচার করা হয় বছরের শেষে পাওয়া মার্কশিটের ভিত্তিতে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত চরিত্রগঠন, অথচ এই শিক্ষা চরিত্র তৈরি করছে না। নির্দিষ্ট প্রোটোকল, নির্দিষ্ট সিলেবাস, বছর শেষে প্রতিযোগিতা, তার উপর শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের অবনমন। অবনমন কর্মক্ষেত্রে কম কিছু হয় না আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলেও কম কিছু না। বহু ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে আজ যুবসমাজ কতটা মানসিক চাপে অসহায়। সব ক্ষেত্রেই আমাদের স্বাধীনতার উপর অযাচিত

হস্তক্ষেপ করে এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা। বিদেশি সভ্যতার কাছে যেন আমরা এক দাসসুলভ, এক দুর্বল মানবগোষ্ঠী। ইন্টারনেটের দুনিয়াতে সামাজিক মাধ্যমগুলি যোগাযোগ নয়, যেন একে অপরকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও বিদ্রূপ করার কারখানা। বেশিরভাগ ওয়েবসিরিজ তৈরিই হচ্ছে যুবসমাজকে ধ্বংসের দিকে আরও কয়েকপা এগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। যেখানে পারিবারিক সম্পর্ককে যৌনতা পরিতৃপ্তির মাধ্যমরূপে দেখানো হচ্ছে। এরফলে যুবসমাজ চলে যাচ্ছে গভীর অবসাদে, বিকারগ্রস্ততায়। সবকিছুরই ভালো খারাপ দুটোই থাকে, কিন্তু সেটা বিচার করে দেবে কে? বাবা-মা তো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সেভাবে সন্তানের সাথে একাত্ম হন না। তারাও যে প্রতিযোগিতার খেলায় ইঁদুরদৌড়ে মত্ত। কে সার্থক করবেন স্বামীজীর কথা—"Education is the manifestation of perfection already in man. Divinity is the manifestation of the religion already in man."

৯৫ বছর ধরে জাতিগঠনের সংকল্প নিয়ে ভারতবর্ষকে জগদ্‌গুরুর আসনে আসীন করতে সর্ববৃহৎ সেচ্ছাসেবী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখায় তিনটি 'H'-এর বিকাশ ঘটানো হয়। Health, Head & Heart, শরীরচর্চা, বৌদ্ধিক ও মনীষীদের জীবনদর্শন এবং সমভাবের মাধ্যমে মনুষ্য নির্মাণ করা হয়। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, যে বর্তমানে বেশিরভাগ যুবকে অনেকক্ষেত্রে অপমানিত হলে বা অপমানিত হলে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। কিন্তু আমরা তাদের উৎসাহিত করার জন্য যদি মনীষীদের জীবন অধ্যয়ন করতে বলতাম, তবে এমনটা নাও হতে পারত। যেমন এক ব্রাহ্মণ এক ভরা রাজসভায় অপমানিত হয়েছিলেন। অপমানের মাত্রা এতটাই যে, তার শিখা ধরে পদাঘাত করে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তিনি সে শিখা আর বাঁধেননি, তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এই অত্যাচারী রাজাকে উৎখাত করবেনই। বহু চেষ্টায় তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্যেকে উপযুক্ত ভাবে তৈরি করে সেই অত্যাচারী রাজাকে উৎখাত করলেন, তাঁর শিষ্যকে রাজ-সিংহাসনে বসালেন ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করলেন বিদেশি আক্রমণ থেকে, নির্মাণ করেলেন অখণ্ড ভারত। সেই অপমানিত ব্রাহ্মণ ছিলেন মহাপণ্ডিত বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য, যাঁকে আমরা চাণক্য কৌটিল্য নামে জানি। তিনি নন্দবংশের অত্যাচারী রাজা ধননন্দকে ক্ষমতাচ্যুত করে বীর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যকে ক্ষমতাসীন করলেন। তিনি তাঁর অপমানের প্রতিশোধ এভাবে নিয়েছিলেন। তিনিও যদি অবসাগ্রস্ত হয়ে পড়তেন তাহলে হয়তো দেশজননী বহু আগেই বিদেশি শাসনে চলে যেত। আজও এভাবে কত উজ্জ্বল সম্ভবনা আত্মঘাতী হচ্ছে। ভারতের মনীষীদের জীবন অধ্যয়ন করলে এরকম অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আজ এমন অবস্থা মনীষীদের জীবনী বলতে যতটুকু পাঠ্যে থাকে, যা কিনা বহুলাংশেই অণু পরিমাণ। বহু যুবক যারা স্বামীজীর স্বদেশমন্ত্র সম্পর্কে অবগত নন। যারা প্রোটোকলের কারখানাতে তৈরি হচ্ছেন আর নিজ সভ্যতা সংস্কৃতি ভুলে অবিরাম ছুটে চলেছেন। এমতাবস্থায় অবসাদ স্বাভাবিক। কিন্তু উপায় কি নেই? আছে তো। দিনে এক ঘণ্টা সঙ্ঘশাখায় আসুন, বাবা মায়েরা জানুন সঙ্ঘকে। সহভাগী হন মনুষ্য নির্মাণের এই যজ্ঞে। মনীষীদের জীবনসম্পর্কে নিজেরা জানুন ও জানান। তাই তো সঙ্ঘশাখায় বৌদ্ধিক বিকাশের মাধ্যমে ঠিক-ভুল বিচার করতে শেখায়, নিজ দেশমাতৃকার জন্য সম্পূর্ণভাবে গড়ে তোলে, নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা দেয়, নিজ সংস্কৃতিকে চেনায়, সর্বোপরি নিজের উপর বিশ্বাস তৈরি করে, আত্মনির্ভর করে, দেশপ্রাণ স্বয়ংসেবক নির্মাণ করে। যারা বারবার দেশমাতৃকার বিপদে নিজেদের সমর্পণ করেছেন। সেটা ৬২-র ভারত-চীন যুদ্ধই হোক কী সম্প্রতি কোরোনাকাল। প্রবল বিরোধীরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ দেখে। সম্প্রতি ইয়াস বিপর্যয়ে রাজ্যের বহু জায়গায় যেখানে সরকারি লোক পৌঁছাতে পারেনি, সেখানে পৌঁছে গিয়েছে স্বয়ংসেবকরা। ভারতমায়ের কোনো সন্তান যেন অসহায় না বোধ করে, সে দায়িত্ব নিজ কাঁধে কর্তব্য রূপে তুলে নিয়েছেন স্বয়ংসেবকরা। সঙ্ঘ প্রচারবিমুখ, তাই প্রচারের আলোতে না থেকেই রাষ্ট্রনির্মানে ব্রতী। বহু বাধা, বহু বিপত্তি সত্ত্বেও সঙ্ঘ নিজ পথে অটল থেকে শতবর্ষে পদার্পণের পথে এগিয়ে চলেছে। সঙ্ঘ থামতে জানে না। উদ্দেশ্য যেখানে মহৎ, সে পথ কণ্টকময় হলেও এগিয়ে চলাই মন্ত্র। এগিয়ে চলবেও, ভারতমাতাকে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসানোর সংকল্প নিয়ে। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

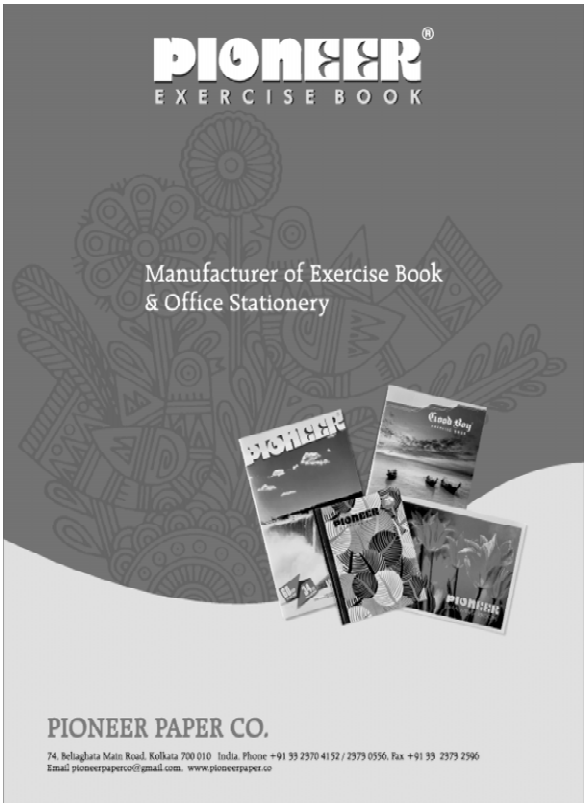

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫